হাড়ভাঙা

–শামীম চৌধুরী

যায়যায়দিনের ঘোষণা পেয়ে এখানে–সেখানে অনেক কষ্টে খোজাখুজির পর শেষ পর্যন্ত আলমারিতে পাওয়া গেল সেই পুরনো ডায়রিটা। কোনো কাজে লাগবে না বলে অবহেলায় পড়েছিল একগাদা আধাছেড়া কাগজের টুকরোগুলো। সেই বিশাল ডায়রির সারমর্ম লিখতেও কষ্ট হয়ে যাবে *সা'তশ* শব্দের *প্রবাসী*–তে।

বস তার গালাগালির সীমা অতিক্রম করে ফেললেন। কারণ গত দুই দিন যাবৎ আমার কাজে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। অবশ্য তিনি কেন, আমিই স্বীকার করছি যে, কন্সট্রাকশন কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। পাহাড় কাটা, সিমেন্টের বস্তা মাথায় করে টানা, ইট, বালি সিমেন্ট মিক্স এ ছিল প্রতিদিনের শারীরিক নির্যাতন। কিন্তু কি করবো? ফ্যাক্টরিতে পারমিট দেয়া হবে না তাই এখানে আসা। প্রতিদিন বিকেলে ছাদে একা একা ঘুরতাম এবং নীরবে চোখের জল ফেলতাম। কেদে কোনো লাভ হবে না। সকাল হলেই আবারও শুরু হবে।

চারদিনের মাথায় সবাইকে জানালাম যে, এখানে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। হারুনভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যাগে পুরে বাবুলভাইয়ের বাসায় রেখে রাস্তায় নামলাম চাকরির খোজে। যদিও বা এই মুহূর্তে ফ্যাক্টরিতে চাকরি পাওয়ার আশা খুবই কম।

আলম গেস্ট হাউসে এক বাংলাদেশির সঙ্গে কথা হলো, জহরবার এলাকায় একটা কাজ আছে। তবে পরের দিন আমাকে নিয়ে যাবে। সারা দিন ঘুরে রাতে ওই বাঙালির বাসায় থাকলাম। পরের দিন খবর পেলাম ওই কম্পানি কোনো লোক নেবে না। কি আর করা! ঠিকমতো খাওয়া নেই, গোসল নেই আবারও ঘুরতে লাগলাম। সারা দিন এর ওর কাছে ঘুরে ঘুরে রাত কাটানোর জন্য কন্সট্রাকশনে হারুনভাইদের ওখানে গেলাম। মিরাজভাই বললেন, হারুনভাই ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়ে দুজনকে নিয়ে গেছে। কাল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তিনি আরো জানালেন যে, মণিদাদা, শাহাবুদ্দিনসহ তারা আগামীকাল প্লান্টেশনে চাকরিতে জয়েন করবে।

তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে আমিও ঢুকে গেলাম। কিন্তু হায়! এ যে কন্সট্রাকশনের কিছুই কম না। রোদের মধ্যে মাটি খুড়ে গাছ লাগানো, রাস্তার দুই পাশে ঘাস কাটা, করাত দিয়ে গাছ কাটা, লরি লোড–আনলোড করা যা ছিল আমার শারীরিক শক্তির ঊর্ধে।

পারমিট লাগানোর জন্য বস পাসপোর্ট চাইলে বাবুলভাইয়ের বাসায় রেখে আসা ব্যাগটি আমি আনতে গেলাম। কিন্তু মাথায় বজ্রপাত হলো বাবুলভাইয়ের কথা শুনে। তিনি বললেন, আমার ব্যাগ হারুন তার বাসায় নিয়ে গেছে এবং সেটা হারিয়ে গেছে।

আপনি এসব কি বলছেন? ব্যাগে আমার পাসপোর্ট আছে।

বাবুলভাই কোনো কথা বললেন না।

আমি রাস্তায় নামলাম। মাথা প্রচুর ব্যথা করছে। কি করবো বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ আগে ক্ষুধার্ত পেটের ক্ষিধেটাও মরে গেছে। পানির পিপাসা লাগছে প্রচুর। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম ২৫০ রিংগিট। এই টাকায় পাসপোর্ট, পুলিশ রিপোর্ট বানানো যাবে। তবে খাওয়া খরচটা কমাতে হবে। মিরাজভাইদের সব কিছু জানিয়ে কাজ ছেড়ে দিলাম। কিছু কাগজ কিনে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন লেক গার্ডেনে পাগলের মতো ডায়রি লিখতে শুরু করলাম। কিছুদিন এভাবে চলার পরে ভাবলাম, এভাবে আর কতোদিন! তারচেয়ে জামান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখা যেতে পারে। হোক সে দালাল, চিটার। তারও তো একটা মন আছে!

তার অফিসে হাজির হতেই তিনি বত্রিশ দাত বের করে বললেন, কি রে, অনেক দিন তোর কোনো খবর নেই। এ কি চেহারা হয়েছে তোর।

আমি সব খুলে বললাম।

পান খেয়ে লাল করা বত্রিশটি দাত আবারও বের করে হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে। তোকে একটা কাজ দিচ্ছি প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে, ১৮ টাকা বেসিক। ওভারটাইম আছে। রবিবার ডাবল পে। তবে ওই কাজের জন্য আমাকে দুইশ রিংগিট দিতে হবে। আবারও হাসলেন।

তার কথা বিশ্বাস না করে বললাম, আপনাকে ২৫০ রিংগিট দেবো এমন একটা কাজ দিতে পারলে।

তিনি রেগে গিয়ে আমাকে নিয়ে ওই কম্পানিতে চলে গেলেন।

গিয়ে শুনলাম ১২ ঘণ্টায় ১৮ টাকা। জামান সাহেবের উচ্চ হাসি তো দূরের কথা, মৃদু হাসির নিশানাও পাওয়া গেল না।

তার রুমে রাত কাটালাম দশ বারোজন। হয়তো তিনি চাকরি দেয়ার কথা বলে সবাইকেই এখানে এনে রেখেছেন। জামান সাহেবের আশা ছেড়ে দিলাম। এক বাঙালি খোজ দিল আরেকটা কম্পানির। দুজন লোক দরকার। আমিসহ আরেকজন গিয়ে দেখলাম ভুয়া, কিছুই নয়। আমার সঙ্গের এই ছেলেটি আমার সব খবর শুনে আমাকে নিয়ে শহরের বাইরে এক ফোম ফ্যাক্টরিতে কাজ দিল। বেতন কম হলেও একটা আশ্রয় পেলাম। আল্লাহর তরফ থেকে না তিনি এলে এতো বড় একটা আশা দিতে পারতেন না যে, কিছুদিনের ভেতরেই আমার একটা ভালো চাকরি হবে।

সত্যিই তাই। পাচ ছয় দিন কাজ করার পরে আমার পুরনো বন্ধু মিলন সংবাদ দিল যে, আমার হারানো ব্যাগ পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে ভালো একটা ফ্যাক্টরিতে কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। মিলনসহ আমি নতুন ফ্যাক্টরিতে যোগ দিয়ে ভিসা, পাসপোর্ট, পারমিট নিয়ে খুব ভালো দিন কাটাচ্ছি।

আসলে প্রবাস যে কতো কঠিন তা প্রবাসীরা আর আল্লাহই ভালো জানে। একজন প্রবাসীকে সারা দিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর রান্না, কাপড় ধোয়া, গোসল করা, বাজার করা, ভিসার চিন্তা, পারমিটের চিন্তা, দেশের চিন্তা নিয়ে সারাক্ষণ থাকতে হয়।

সপ্তাহের দুঃখ-কষ্ট এক সময় ভুলে যাই সাপ্তাহিক ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার টেবিলে। মাসের জমানো দুঃখ-কষ্ট এক সময় ভুলে যাই হাড় ভাঙা পারিশ্রমিক বেতনটা হাতে পেলে। হয়তো বছরের দুঃখ-কষ্ট এক সময় ভুলে যাবো দীর্ঘ ছুটিতে দেশে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দে।

কুয়ালা লামপুর থেকে

চাদের আলোয় অন্ধকার

–রিফাত সায়মন সাগর

ছোটবেলায় অতি আগ্রহের কারণে নতুন কিছু শিখলেই সহপাঠী বন্ধুদের শুধু প্রশ্ন করতাম, আমি যা জানি তা তারা জানে কি না যাচাই করে দেখতাম। পরীক্ষা শেষে এক আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গেলে জ্যোৎস্নাকে প্রশ্ন করলাম, কারেকশন করো, Man is mortal.

সে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো আর উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসিতে ফেটে পড়লো। সে কি মিষ্টি হাসি! হাসি থামিয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনি বুঝি খুব ভালো ইংরেজি জানেন?

বললাম, খুব ভালো না। তবে মোটামুটি পারি।

আমাকে কিছু নোট দেবেন কি?

এরপর আলাপ–আলোচনা–সমালোচনা–নানান বিষয়ে দুজনে মিলে যেন শেষ হতে চায় না। দিনের পর দিন চুম্বক সম্পর্ক গড়ে উঠলো দুজনার। কি যেন এক অজানা আকর্ষণে হারিয়ে যেতে লাগলাম। মধুর এক ভালোলাগার মধ্যে ডুবে যেতে থাকলাম। শুধু তার আখি পানে তাকিয়ে থাকতাম। কি অপূর্ব চাহনি, কি সুন্দর তার চোখ দুটি। এই ভালোবাসার মানুষ জ্যোৎস্না আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া।

এরি মধ্যে ঘটলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। জ্যোৎস্না কিছু বই চাইলো। আমি কিছু বই যোগাড় করে তাকে দিলাম। আবেগ তাড়িত হয়ে বইতে কিছু প্রেমের সংলাপ লিখে দিলাম। তার ইমিডিয়েট বড় ভাই মাহাবুব তার সঙ্গেই পড়তো। বইগুলো মাহাবুবের নজরে পড়লো। বইয়ের ভেতর প্রেম সম্পর্কীয় লেখা দেখে জ্যোৎস্নাকে বকাবকি করলো এবং তাদের হাউস টিউটরকে দিয়েও বকা শোনালো। এতেই আমার ওপর জ্যোৎস্না তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। আমাকে বাজে বললো। ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। আমিও লজ্জায় ওই বাড়ি যাই না।

এভাবে দীর্ঘ এক বছর কেটে গেল। এবার তার সঙ্গে অন্যভাবে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা হিসেবে চিঠি লেখা শুরু করলাম। একদিন চিঠিও ধরা পড়ে গেল। জ্যোৎস্নার আব্বা আমাদের বাড়ি এসে আমার বাবা মাকে ধমকিয়ে যাচ্ছেতাই বলে গেলেন। রাগে, অপমানে আমার বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন এবং আমার লেখাপড়ার বন্ধ করে দিলেন। আমার বড় ভাইয়েরা যেন আমার পড়া বন্ধ করার জন্য এই ধরনের ইসুর অপেক্ষা করছিলেন। তাদের চক্রান্তে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হলাম।

চলার কোনো গতি পেলাম না। চারদিকে অন্ধকার দেখছি। এ অবস্থায় কিছুটা বিপথগামী হলাম। বাজে আড্ডা, রাত করে ঘরে ফেরা, এসবে মা দিশেহারা হলেন। মা ছাড়া এখন আর কেউ আমার খোজ করেন না। নিজ গৃহে বাবা ও ভাই থাকতে আমি যেন এতিম হয়ে গেলাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেন না। রাতে যতোক্ষণ ঘরে না ফিরি ততোক্ষণ মা খাবার নিয়ে বসে থাকেন। ভাত বেড়ে দিতে দিতে মা শুধু কাদেন, তোর বুঝি আর পড়া হবে না, তোর কি এভাবে দিন যাবে?

বাবা সরল ও একরোখা মানুষ। তাই মা জানতেন বাবাকে বার বার বলে লাভ হবে না। প্রেমের অপবাদে যতোটুকু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত তারচেয়েও বেশি ব্যথিত করে মায়ের চোখের জল।

অতন্দ্র প্রহরীর মতো সারা রাত জেগে থাকি আর আহত পাখির মতো যন্ত্রণায় কেদে কেদে বলি, আমি তো শুধু ভালোবেসেছিলাম। তার শাস্তি এতো কঠিন হলো কেন!

একদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলে তোর জন্য কারো চিন্তা হয় না ভেবেছিস বলেই মা আমাকে মারতে লাগলেন। মারতে গিয়ে মা নিজেই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মায়ের সঙ্গে আমিও কেদে বললাম, কাউকে ভালোবাসার পরিণতি এতো কুৎসিত হবে জানা ছিল না মা। আমাকে ক্ষমা করো।

পরদিন মা কিছু টাকা দিয়ে বললেন, যা কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে আয়।

না মা, আমি এখানে ভর্তি হবো না। এদের থেকে আমি অনেক দূরে চলে যেতে চাই। যদি তুমি রাজি হও তাহলে আমি ঢাকায় ভর্তি হবো।

টিউশনি ও মায়ের টাকায় আমি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি কলেজে যখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে তখন জ্যোৎস্নার পরিবার আমার সরল মা বাবার সঙ্গে আরেক খেলায় মেতে উঠলেন। তারা এবার জ্যোৎস্নার ছোট বোন রেনুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। মায়ের যেহেতু বয়সে বড় সেহেতু মা সরাসরি কিছু না বলে এই লোকটির মুখপানে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু বাবা স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করলেন। মা জানতেন যেখানে তার ছেলে জ্যোৎস্নাকে ভালোবাসে সেখানে রেনু অবাঞ্ছিত। তাছাড়া ইতিমধ্যে তার এক খালাতো ভাইয়ের হাত ধরে সে পালিয়েছে। তিন দিন পর জ্যোৎস্নার ভাইয়েরা ধরে এনে তার চুল কেটে দেয়।

এদিকে ১৯৮৭ সালে বাবা মায়ের কাছে রেনুর বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জ্যোৎস্নার বাবা আরেক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। জ্যোৎস্নার ভাই মাহাবুব ইতিমধ্যে জাপান যায়। দুই বছর পর মাহাবুব দেশে ফিরলে তার আব্বা প্রচার করে যে, মাহাবুব দশটি জাপানি ভিসা এনেছে। জ্যোৎস্নার আব্বা হামদরদি হয়ে আমাকে জাপানে পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। মাকে বললেন, তোমার ছেলে কোথায় কোথায় ঘুরছে। আমার ছেলেরা কতো লোককে জাপানে পাঠাচ্ছে। জাপানে অনেক টাকা কামাতে পারবে।

এভাবে লোভ ও প্ররোচনায় বাবা মাকে রাজি করিয়ে জ্যোৎস্নার আব্বা এক লাখ পচিশ হাজার টাকা নিয়ে গেলেন।

আমি যদিও জানতাম, সেলফ প্রসেসিংয়ে ওই সময় মাত্র ষাট হাজার টাকায় আমার কয়েকজন বন্ধু জাপানে গিয়েছে। তবে সেলফ প্রসেসিং-এ ডিপোর্ট হওয়ার ঝুকিও ছিল। এরপরও বাবা ও বড় ভাইকে বললাম, জাপান যেতে কাউকে এতো টাকা দিতে হয় না।

আমি মাত্র ষাট হাজার টাকায় জাপান যেতে পারবো। পাসপোর্টে ডলার এন্ডোর্সমেন্ট, রিটার্ন টিকেটসহ আনুষঙ্গিক খরচ ষাট পয়ষট্টি হাজারের বেশি না। তবে যদি জাপান থেকে ডিপোর্ট হই তাহলে আপডাউন টিকেট বাবদ বিশ হাজার টাকা গচ্ছা যাবে।

বড় ভাই ধমক দিয়ে বললেন, বেশি চালাকি দেখাসনে। ঝুকি নেয়া আমাদের কি দরকার। যেখানে মাহাবুব জাপান থেকে ভিসা এনেছে এবং সেই ভিসাতে মাবু তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আরো বললেন, এভাবেই মাবু ও মাবুর আব্বার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে।

ওই সময় জাপান সফরের জন্য এক হাজার ডলারের বেশি এন্ডোর্সমেন্টের নির্দেশ থাকলেও সোনালি ব্যাংক এর চেয়ে বেশি ডলার পাসপোর্টে এন্ডোর্স করতো না। জাপানের উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্টে এলে মাহাবুব আমার হাতে পাসপোর্ট ও টিকেট দেয়। কিন্তু পাসপোর্টে ছয়শ ডলার এন্ডোর্স দেখে মাবুকে আমি প্রশ্ন করলে জবাবে বললো, পেয়ারভাইকে (তার ভাই) কিছু ডলার দিয়েছি।

বললাম, আমি জানি এক হাজার ডলার এন্ডোর্স বা টিসি করে নিতে হয়। আমার বন্ধুরা জাপান যাবার সময় এক হাজার ডলারের টিসি ছাড়াও আরো কিছু ডলার লুকিয়ে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আপনি বলছিলেন ভিসা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পাসপোর্টে তো কোনো ভিসা নেই। এখন টোকিও এয়ারপোর্টে সমস্যা হবে না তো?

আমার প্রশ্নের জবাবে মাবু বললো, সেটা আমি দেখবো। এরপর ঢাকা থেকে ব্যাংককে একদিন থাকার পর কোরিয়া। কোরিয়া গিয়ে মাহাবুব উধাও। তারপর যা হবার তাই হলো। টোকিও থেকে ফেরত এলাম। অন্ধভাবে বিশ্বাস করা আমার বাবা ও ভাইকে নিয়ে জ্যোৎস্নার আব্বার কাছে গেলাম। টাকা ফেরত চাইলাম। তার আদম ব্যবসায়ী ছেলেরা আমার বাবা ও ভাইকে অপমান করলো। জ্যোৎস্নার আব্বা ও ভাইদের সন্ত্রাসী মনোভাব এবং নিজেদের তাপ-প্রতাপ টিকিয়ে রাখতে অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের প্রতি নির্যাতনের ও প্রতিবেশীদের প্রতি সামান্য ব্যাপারে অত্যাচারের বীভৎস চিত্র জানা থাকায় নীরবে তাদের এই প্রতিশোধ মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

তাছাড়া বাবা বললেন, আত্মীয়তার মর্যাদাবোধ ও সম্মানবোধ তাদের না থাকতে পারে। কিন্তু আমার আছে।

আরো কিছুদিন পর আমি গিয়ে তাদের কাছে টাকা চেয়ে বললাম, প্লিজ, আমার জীবনটা নষ্ট করবেন না।

জ্যোৎস্নার আব্বা আরো উত্তেজিত হলেন। কারণ তার প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু আমি।

মা কার কাছে শুনে সেখানে গিয়ে আমাকে হাত ধরে টেনে আনতে আনতে বললেন, তিনি তোর মুরুব্বি, চাইলে এই টাকা দেবেন এবং যদি এই টাকা তিনি না দেন তাহলে ওয়াদা কর, পাওনা টাকা চাইতে এখানে আর আসবি না।

আমি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মা বললেন, হ্যা বাবা, তোকে আল্লাহ দেবে।

ধীরে ধীরে ওই বাড়ি ছাড়তে ছাড়তে বললাম, আমার মা বলছেন, তাই এই টাকা চাইতে আর আসবো না।

জোৎস্নার আব্বার উদ্দেশ্যে বললাম, তবে মহানুভবতা কাকে বলে আমার মা-এর কাছ থেকে শিখে নিন।

জাপান থেকে ফেরত আসা ও অমানবিকভাবে জোৎস্নার আব্বা কর্তৃক এতোগুলো টাকা ফেরত না দেয়ায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম যদিও কথা ছিল ফেরত দেবে। বাড়ি এলে মায়ের কান্না।

গ্রামে, বাজারে ঘুরতে গেলে হামদরদি সুরে উপহাস করে মানুষেরা বলে, দেখো, আত্মীয়দের দ্বারা প্রতারিত বেচারা! এসবের যন্ত্রণায় দিনের পর দিন দগ্ধ হতে থাকলাম। একেক সময় কান্নায় ভেঙে পড়ি। আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। অসহায় বোবা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার দেখি। আমার জীবনটা শুরুতেই এভাবে নষ্ট হয়ে গেল কেন!

ধিক্কার আসে নিজের প্রতি, ধিক্কার এই সমাজের প্রতি।

ঢাকায় এক বন্ধুর বাসায় থাকি ও খাই। কোথাও যাই না। লজ্জায় বাবা মায়ের সামনেও যাই না। তারা বার বার আমার কারণে অপমানিত হলেন। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। বন্ধুদের পরামর্শে এবার সউদি যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু টাকা! টাকা দেবে কে?

বাবার কাছে গিয়ে বলার সৎসাহস নেই। আমার কারণে ইতিমধ্যে বাবার অনেক টাকা গচ্ছা। তবুও মায়ের সহযোগিতায় সাহস করে বাবাকে বললাম।

বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এতো হতাশ হচ্ছিস কেন, আমি এখনো মরে যাইনি। আল্লাহর কৃপায় আমার সম্পদ এখনো শেষ হয়নি। তুই সউদি যাবার চেষ্টা কর, আমি টাকার ব্যবস্থা করবো।

বাবার বুকে মাথা রেখে আমি অনেকক্ষণ কাদলাম।

কে জানতো সউদি আরবে এই সুখময় সাফল্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সম্মানজনক পোস্ট, ভালো বেতন, রিটার্ন টিকেটসহ প্রতি বছর এক মাসের ছুটি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যা করে তা ভালোর জন্যই করে। জাপান গেলে প্রতি বছর মাকে দেখতে পারতাম না। আমার প্রতিবেশী একজন বিয়ে করে জাপান গেছে। আজ ষোল বছর বেচারা আসতে পারছে না।

সউদি আসার দুই বছর পর বাবার পীড়াপীড়িতে বিয়ে করি। উচ্চ শিক্ষিত, শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা পরিবারের কন্যা। মা-বাবার সেবার ত্রুটি আমার শিক্ষিত স্ত্রী করে না। ভোর রাতে বাবা মাকে অজুর পানি দেয়া থেকে শুরু করে কখন কি ওষুধ খাওয়াতে হবে, মাকে কোন শাড়ি পরাতে হবে সব কিছু চমৎকার রুটিন ডিউটি তার। এই কথা আমি বলছি না, সাত গায়ের সব লোকই বলাবলি করছে। আমার বাবা মাও বৌয়ের ওপর খুবই সন্তুষ্ট। আমি তো তাই চাই। বাবা মায়ের দোয়া ও আল্লাহর কৃপা।

আজ এগারো বছর সউদিতে। বাবা মারা যাবার পর স্ত্রী, কন্যা-পুত্রসহ সউদিতে অবস্থান করছি। প্রতি বছর মাকে দেখাশোনা করতে চার পাচ মাসের জন্য স্ত্রীকে দেশে পাঠাই। সপরিবারে পবিত্র হজ সম্পাদনের তৌফিক আল্লাহপাক দান করেছে। আল্লাহপাকের দরবারে কোটি কোটি শোকর আদায় করি যে, এই প্রবাসে আল্লাহপাক অনেক সুখে রেখেছেন।

এরপরও কি জানি অজানা কারণে মাঝে মধ্যে মনটা ভীষণ খারাপ হয়। হয়তো দেশের জন্য, হয়তো না পাওয়া কিছুর জন্য। তবে এবার দেশে গিয়ে একটা খবর শুনে ব্যথিত হই। শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়ার কারণে জোৎস্নার স্বামীর সঙ্গে তার ডিভোর্সের মামলা চলছে। জ্যোৎস্না চন্দ্রালোক। অথচ স্নিগ্ধ আলোয় এ যেন একখণ্ড অন্ধকারের ঘনঘটা। জ্যোৎস্না সে নিজেও কালো, জামের মতো। তবু প্রেম মানে না কোনো জাত-পাত, প্রেম মানে না কোনো বর্ণ ও রিস্তা। তাই হয়তো প্রেমের বাধ ভাঙা টানে জেনেশুনেই একটি ব্যভিচারী ও অর্থলিপ্সু পরিবারের মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম।

কিভাবে এই বাধ ভাঙা প্রেমে পড়েছিলাম ভাবলে এখনো অবাক লাগে! তবে মা ও আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করতে পেরে সুখ পেয়েছি। যেহেতু পৃথিবীটা বিরাট, সেহেতু মনটা ছোট করে নিজেকে ছোট রাখবো কেন! নামাজ শেষে কিংবা ছুটিতে দেশে গেলে কবর জেয়ারত করে জোৎস্নার আত্মার বেহেশত নসিবের দোয়া করি।

সউদি আরব থেকে

এয়ারপোর্টে প্রতারণা

দীর্ঘ ছয় বছর পর ইটালি থেকে দেশে যাই ১৪ মার্চ ১৯৯৭ সালে। এই প্রথমবার দেশে যাচ্ছি। তাই মনে একটু ভয়। কারণ এয়ারপোর্টে অনেক ঝামেলা করে শুনেছি। তবে যাওয়ার সময় তেমন সমস্যা হয়নি এয়ারপোর্টে। গৃন সিগনাল দিয়ে বের হয়ে গেলাম। আড়াই মাস পর দেশ থেকে রওনা হই মে মাসের ২০ তারিখ ১৯৯৭ সালে। ইটালির উদ্দেশ্যে মাল বুকিংয়ে দেয়ার জন্য লাইনে দাড়ালাম।

এরপর দুইজন লোক এসে বললো, আপনার লাগেজে মাল বেশি। আমাদের সঙ্গে যদি কন্ট্রাক্ট করেন, অনেক টাকা বেচে যাবে।

বললাম, ত্রিশ কেজি পর্যন্ত ছাড়ছে। আমার লাগেজে ত্রিশ কেজির বেশি নেই।

তারা বলে, আপনার হ্যান্ড ব্যাগ ভারী এটা হাতে নিতে দেবে না। অতিরিক্ত পনেরো কেজি ওজন চার্জ দিতে হবে। পনেরো হাজার টাকা আসবে। আমাদেরকে পাচ হাজার টাকা দিলে চলবে।

নতুন হওয়াতে ভয় ভয় লাগছে। তাড়াহুড়ো করে বললাম, ভাই আমার কাছে এক হাজার চারশ টাকা আছে।

তারা মানে না। শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধে রাজি হলো। একটু পরে লাগেজ বুকিংয়ে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাগ বুকিংয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। পনেরো কেজি ব্যাগটা হাতে করে বিমানে উঠি। বুকিংয়ে দেয়ার সময় তাদের একজনকে বললাম। ভাব দেখে মনে হলো এখন আর আমাকে চেনে না, তারা কিছুই জানে না। তাদের একজন বয়স্ক, দাড়ি আছে। নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কাল দাগ হয়ে গেছে। অথচ যাত্রীদেরকে হয়রানি করে। সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকায়।

সেই দিন প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো এদেরকে সেই সুযোগ দেবো না। দ্বিতীয়বার একই সমস্যা। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২। মাল বুকিংয়ে দিয়েছি। তারা বলে চল্লিশ কেজি। আমি বলি ত্রিশ কেজি। কারণ আসার সময় লাগেজ ওজন করে এনেছি। ভুল হওয়ার কথা নয়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা, বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে মাল বুকিং দেয়ার সময় মিটারে কতো ওজন তা যাত্রীরা দেখে না। যাত্রীদেরকে বাড়তি ওজনের কথা বলে টাকা দাবি করে অথবা লাগেজ থেকে মাল কমানোর জন্য বলে। এতে যাত্রীরা ভীষণ বিপদে পড়ে যায়।

অনেক যাত্রী ঝামেলা থেকে বাচার জন্য টাকা দিয়ে সমাধান করে। অথচ বিদেশে দুই নাম্বারি সিসটেম নেই। কোনো রকম হয়রানিও নেই। আমার লাগেজ শেষ পর্যন্ত ত্রিশ কেজি মেনে নেয়। তাদেরকে প্রতারণার সুযোগ দিইনি।

তৃতীয়বার ২৯ আগস্ট ২০০২। ওই দিন এমনিতে মন ভালো নেই। প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে প্রবাসে যাওয়া খুবই কষ্ট। ভীষণ ভারাক্রান্ত মনে ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করলাম এয়ারপোর্টে। ব্যাগ চেকিংয়ে দিলাম।

চেক শেষে সিকিউরিটি অফিসার বলে, আপনার লাগেজে অবৈধ মাল আছে, খুলতে হবে।

আমি অনুরোধ করে বলছি, লাগেজে অবৈধ মাল নেই। আমাকে হয়রানি করবেন না। যদি লাগেজ খোলেন তাহলে আপনারাই বন্ধ করবেন। কারণ বন্ধ করা কঠিন হবে।

কথাগুলো রেগে বলেছি। কারণ আগে অনেক হয়রানির শিকার হয়েছি। আমার কথাগুলো শুনে সামনের টেবিলে বসা শ্যামবর্ণের লম্বা ম্যাডাম দাড়িয়ে বললো, এই ছেলে, এই ছেলে, তুমি কি বলতে চাও?

সিকিউরিটি অফিসার বলছে, ম্যাডাম রাগ করেছেন, টেবিলে কিছু টাকা দিয়ে চলে যান।

বললাম, অবৈধ মাল যদি থাকে, প্রয়োজনে অ্যারেস্ট করুন, এক টাকাও দেবো না।

আমার প্রতিজ্ঞা, এয়ারপোর্টের প্রতারকদেরকে আর প্রশ্রয় দেবো না। দাড়িয়ে দেখছি অনেকের কাছ থেকে এভাবে টাকা নিচ্ছে ম্যাডাম।

একটু পরে সিকিউরিটি অফিসার বলে, আচ্ছা, লাগেজ নিয়ে চলে যান।

এভাবে প্রতিদিন হয়রানির শিকার হচ্ছে কেউ না কেউ। আমাদের দেশে দুর্নীতি সব জায়গায় আছে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে দুর্নীতি আর হয়রানি হয় না। অন্ততপক্ষে এয়ারপোর্টটা দুর্নীতিমুক্ত করা যায় না?

নামবিহীন, ইটালি থেকে

পান্থশালা

–জাকির

বাইরে ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে। এয়ারকন্ডিশনড ওয়েটিং রুমে বসেও ভেতরে কনকনে ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। নো স্মোকিং এরিয়া। তাই সিগারেট টানারও কোনো উপায় নেই। অগত্যা এক কাপ কফি নিলাম অটোমেটিক মেশিনে পয়সা ফেলে। তিনশ ওন। প্রায় পনেরো টাকা বাংলাদেশি টাকার। টিভির দিকে তাকাতে পারছি না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এক চেয়ার দূরত্বে বসে খুনসুটিতে মত্ত যুগলের দিকেই বরং মন টানছে বেশি। কি দারুণ আদরে মেতে আছে। এটা কোরিয়ার পথেঘাটে নতুন দৃশ্য নয়, তবু দেখতে ভালো লাগে।

এখন সন্ধ্যা। টার্মিনালের সামনেই সারি সারি বাসগুলো দেখা যাচ্ছে। তুষারে ভিজে ভিজে আসছে, ছেড়ে যাচ্ছে, সিউল, পুচ্ছন, ডেগু, সোয়ান, ছংজু সমস্ত কোরিয়াতে তাদের গন্তব্যে। আমি বসে আছি আনসান বাস টার্মিনালে। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প নগরী। গন্তব্য ছংজু। সিগারেট টানতে টার্মিনালের পেছন দিকে এলাম। কাচের দরজার বাইরে পা দিতেই হাড় পর্যন্ত কেপে উঠলো। বা দিকে দূরে হোমপ্লাস–এর তুষারের ম্লান আলো।

এই ঠাণ্ডায়ও জমজমাট শপিং মলটি। সিগারেট তেতো লাগছে। গত রাতের হ্যাংওভার কাটেনি। শুধু ক্ষণে ক্ষণে মীনহী–র কথা মনে পড়ছে। ঠোটে এখনো একটা নোনা স্বাদ। এতোক্ষণ পর খেয়াল হলো ডানদিকের নির্জনতায় চুমুরত মগ্ন দুজনকে। না, আমাকে দেখে ওরা লজ্জা পায়নি। এটা কোরিয়া। আমি বরং বিব্রত। সরে এলাম ওয়েটিং রুমে। আমার বাস সাড়ে সাতটায়।

পাশ থেকে একজন ইন্দোনেশিয়ান হাংগুমালে (কোরিয়ার ভাষায়) উইশ করলো। উত্তরে শুধু মাথা নাড়লাম। ওদের দেখলে আমার খুব হিংসা লাগে। কম বয়সী ছেলেমেয়েরা স্বল্প খরচে এখানে আসে, টাকা রোজগার করে, হই হল্লা করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই দেশে ফিরে যায়। রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, চায়না, পাকিস্তানসহ আরো কয়েকটি দেশ থেকে কোরিয়া শ্রম আমদানি করে।

শুধু বাংলাদেশে এবং পাকিস্তান থেকে কোনো চুক্তি ভিত্তিক মেয়ে শ্রমিক আসে না, অন্য সব দেশ থেকেই কম বেশি আসে। রাশিয়া এবং ফিলিপিন্স–এর মেয়েদের, নাইট ক্লাবগুলোতেই বেশি দেখা যায়। এ দেশে অধিক সংখ্যক চায়নিজ এবং অবৈধ অভিবাসীদের তালিকায় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান অন্যতম। এর কারণ প্রথমত. দরিদ্র দেশের নাগরিক, হয়তো আসার খরচ অত্যধিক। ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা থেকে এখানে আসতে সর্বোচ্চ খচর হয় ছয়শ থেকে পনেরো ডলার পর্যন্ত। সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রতিটি শ্রমিকের পাচ হাজার থেকে সাত হাজার ডলার পর্যন্ত লাগে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোক এখানে আসে। অবশ্য তাদের প্রত্যেকের ফাইল পরীক্ষা করলে দেখা যাবে একটা স্বীকারোক্তিতে তার স্বাক্ষর করা আছে। তাতে লেখা আছে, আমি এক হাজার চারশ চল্লিশ ডলারের বেশি এই প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করিনি। আমি একজনকেও এখনো পাইনি যার বাংলাদেশ থেকে কোরিয়া আসতে মাত্র এক হাজার চারশ চল্লিশ ডলার দিতে হয়েছে।

প্রকৃত পরিমাণ এর তিন চারগুণ। তাই মূলধন উশুল, তারপর লাভ ফলাফল, চুক্তি শেষে অবৈধ হয়ে পালিয়ে থেকে যেতে হয় কোরিয়াতে। কেউ বা আরো লোভে জীবনের ঝুকি নিয়ে পাড়ি জমায় জাপানে। কেউ পৌছায়, কেউ চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় সাগরে।

ঠিক সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়লো। আমার সিটটা জানালার পাশে। শেষ মুহূর্তে দৌড়ে আসা মেয়েটির একজন আমার পাশে বসলো। বাস ছাড়ার মুহূর্তে দেখলাম আমার ওপর প্রায় উপুড় হয়ে জানালায় উকি মেরে বিদায় জানালো পৌছে দিতে আসা যুবককে।

তারপর চোখের আড়াল হতেই চুল এবং বসন থেকে তুষার কণা ঝেড়েঝুড়ে মন দিল নিজের ছোট কালার হ্যান্ডফোনটাতে। যথারীতি ভিডিও গেম। এরা সারাক্ষণ ভিডিও গেমে কি যে মজা পায়! পি.সি.বাং অর্থাৎ ঘর বা রুমগুলোতেও দেখা যায় সবাই গেমে মত্ত। খেয়াল করলাম, মেয়েটা এই মাইনাস সাত ঠাণ্ডাতেও নিচে শুধু স্কিন মোজা পরে আছে। বন্ধু তরুর মতে, এদের নাকি ইয়ে গরম থাকে। তাই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগায়।

তুষারের কারণে বাস খুব ধীরে চলছে। আজ হয়তো দেড়ঘণ্টার পথটুকু তিন ঘণ্টাই লেগে যাবে। ভেতরের লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, প্রায় সবাই ঘুমানোর চেষ্টা করছে। আমি বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। তাই এখন চেষ্টা করে লাভ নেই। জানালা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম আলোছায়াতে

তুষার স্নাত পাহাড় আর জঙ্গলের শোভা। এবং মাঝে মধ্যে মাথা উচু করে দাড়ানো সারি সারি এপার্টমেন্টগুলো। এ দেশের ৭০% স্থলভাগই পাহাড়। এবং পাহাড় মানেই বনভূমি।

পাশের মেয়েটা ঘুমে কাত হয়ে আমর কাধে ঠাই নিয়েছে। স্পষ্টই টের পাচ্ছি ওর কালার চুলের মৃদু ঘ্রাণ, আমার চোখে ভাসছে মীনহী-র মুখটা। টের পাচ্ছি ঘাড়ের কাছে উষ্ণ নিঃশ্বাস। খুব সাবধানে তাকালাম মেয়েটার মুখের দিকে। ঠোট জোড়া এতো সুন্দর! তবে মীনহীর মতো নয়। স্তন জোড়া থেকে থেকে উঠছে, নামছে। আমি ফের নিশ্চুপ প্রাকৃতিক শোভার দিকে তাকালাম।

গতকাল সারাটা রাত তরু আর আমি বৈকচু (বিয়ার) খেয়েছি। আগে কখনো এমন ছোট বারে এতো রাতে যাইনি। ছোট বারটাতে এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী সঙ্গ দিচ্ছিল এক কোরিয়ান যুবকের। আমরা ঢুকতেই মেয়েটি সার্ভ করতে এলো। বৈকচু এবং খাইল (কয়েক প্রকার ফল ফালি ফালি করে কাটা)। মেয়েটিকে তরু বললো, আমাদের সঙ্গে পান করতে অসুবিধা আছে?

মেয়েটি সলাজ মাথা নাড়ালো। তারপর আমাদের সার্ভ করে নিজেও একটা গ্লাস নিয়ে বসলো তরুর পাশে। তরুই ঢেলে দিল ওকে।

নাম কি?

মীনহী।

নাই অলমা ? (বয়স কতো?)

এবার মেয়েটি হা করে আমার মুখের দিকে তাকালো। তরু অন্যভাবে বোঝালো। বেসারিয়া?

মীনহী হেসে বললো, ছুমুল দুল (বাইশ)।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওর বয়স বড়জোর উনিশ হতে পারে।

বাইশ! কিছুতেই নয়।

পানশালার অন্য খদ্দেরটি চলে যাওয়াতে প্রৌঢ়া এসে জানালেন তার ভীষণ দাত ব্যথা। তাই ঘুমাতে যাচ্ছেন।

তরু বললো, ভাগ বুড়ি! তরু দেয়ালের ন্যুড পোস্টার দেখছিল। ওটা কার ছবি?

মীনহীর উত্তর, আমার।

তোর বুক কি ও রকম?

না, আরো সুন্দর।

কই, দেখি? বলে তরু আঙুল দিয়ে খোচা মারলো।

মীনহী কপট রাগে তরুর পাশ থেকে উঠে আমার পাশে বসলো। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম ওর মোজা পরা সুগঠিত পা, ভরাট বুক দুটো যার অনেকটাই উপচে আছে, ঠোট দুটো যেন আদরের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব, সোনালি-কালো চুলগুলো ছড়ানো।

ও বললো, কি দেখো?

আমি মুগ্ধভাবে বললাম, তুই এতো সুন্দরী কেন?

মীনহী শুধু হেসে উঠলো।

আমার জানা ছিল না, মেয়েদের হাসি এতো সুন্দর হয়। আসলে আমি সব সময় মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছি। এ রকম বার-এ এই প্রথম পান করছি। এই মৃদু আলোয় গ্লাস, চামচ, সকারা (খাবার সময়

ব্যবহৃত কাঠি, চায়না, জাপান ও কোরিয়াতে ব্যাপক প্রচলিত) এসবের টুংটাং শব্দ, সাউন্ড বক্সের মৃদু বাজনা আর বিয়ারের মৃদু নেশা সব মিলিয়ে বেশ রোমান্টিক লাগছিল।

পান করতে করতে এক সময় সোফায় কাত হয়ে তরু ঘুমিয়ে গেল। আমারও প্রচুর নেশা হয়েছে টের পাচ্ছি। গুন গুন করে সুর তুললাম। পান্থশালাতে আলো কমানো থাকে। পান্থশালা যে তাই আমাকে ডাকে, আলোর ঘোরে দেখি ক্ষমাহীন নারী, মন চায় এই আধারে সুরা পান করি... চোখে চোখ রেখে আমি...।

মীনহীকে বললাম, একটা চুমু খাও না।

ও একটু লজ্জাবতী ভাব দেখালো। তারপর চড়ুই-এর মতো টুক করে একটা ঠোকর দিল আমার ঠোটে।

এভাবে নয়।

তাহলে কিভাবে?

আমি ওর মাথার পেছনে চুল খামচি মেরে ধরে ওর ঠোটে ঠোট বসালাম। বোঝা গেল মীনহী মোটেও আনাড়ি নয়।

ও আমার ঠোট কামড়ে দিল, জিভ চুষতে লাগলো আর আমি মাতাল হতে লাগলাম। আমার একটা হাত ওর বুকে যেতেই ও বুকের আবরণ সরিয়ে দিল। জীবনে এই প্রথমবার এতো সৌন্দর্য, এতো সুখ, সত্যিই মাতাল হলাম। এক সময় স্কার্টের ফাকা দিয়ে উরুসন্ধির দিকে হাত বাড়াতেই প্রবল আপত্তি, ওপপা, দাংসিনি নাপ্পুন সারাম? মানে প্রিয়তম, তুই কি বদমাশ লোক?

আমি বললাম, হ্যারে। আমি ভীষণ পাজি লোক।

তারপর ওর স্তন আর ঠোটে আবার মগ্ন হলাম। ওর পেটে হালকা চর্বির আভাস। শরীরে কেমন একটা সৌরভ আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছিল। আমি চরম উত্তেজিত। এক সময় ওর তপ্ত নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এলো। তারপর হঠাৎ আমার বুকে মুখ গুজে ফুপিয়ে কেদে উঠলো। আকস্মিক ওর এই পরিবর্তনে আমি হতচকিত। ওর মাথাটা বুকের মধ্যে রেখে ওকে ভালো করে জড়িয়ে রাখলাম। ওর চুলের ঘ্রাণ নিলাম বুক ভরে। তারপর জানতে চাইলাম ওর আবেগের কারণ।

মীনহী বললো, রাত অনেক হয়েছে, তুমি একটু পরই চলে যাবে। হয়তো আর এখানে এই পান্থশালাতে আসবে না। কিন্তু আমাকে কাল, পরশু, তরশু প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে আসতে হবে। এভাবে অন্য কারো মন রাঙাতে হবে। এর থেকে তো আমার মুক্তি নেই।

কেন, অন্য চাকরি নিলেই তো পারিস?

ও বললো, দেখো, আমার বয়স কম, পয়সার অভাবে পড়াশোনাও হয়নি। মা আমাদের তিন বোনকে রেখে অন্য মানুষের সঙ্গে চলে গেছেন। বাবা কারখানায় অ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু। আমাকেই সব চালাতে হয়।

আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। বললাম, পৃথিবীতে সব মানুষেরই কম বেশি দুঃখ থাকে। আমি সব ছেড়েছুড়ে এই দূর প্রবাসে এসেছি কতো বেদনা নিয়ে তোমাকে কিভাবে বোঝাবো। তবু সম্ভব হলে তোমার জন্য কিছু করতাম। কিন্তু ভেবে দেখো, আমার ক্ষমতা কতোটুকু।

মমতায় আমার বুকটা ভার হয়ে আসছিল। ওর ফোনটা দেখিয়ে বললাম, তোমার নাম্বারটা দাও।

ও নাম্বার দিল এবং আমারটাও নিল।

ওর ফোনের ডায়ালে ওরই রঙিন ছবি ঝলমল করে হাসছে। বললাম, আমারটাতেও তোমার ছবি এনে দাও।

ও কিছুক্ষণ বোতাম টেপাটেপি করে আমার ডায়ালে ওর ছবিটা এনে দিল। জানতে চাইলো সবাই দেখে যখন বলবে এটা কার ছবি, তুমি কি উত্তর দেবে?

আমি বললাম, বলবো একজন দুঃখী মেয়ের ছবি।

মীনহী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখে জল টলমল। আমার মাথাটা টেনে নিয়ে খুব গভীরভাবে একটা চুমু দিল সময় নিয়ে। তারপর বললো, আমি নষ্ট মেয়ে ঠিক তবে কারো সঙ্গে কখনো বিছানায় যাইনি। আমার প্রেমিকের সঙ্গেও আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এই চাকরিটার জন্য। তোমার যদি ইচ্ছে হয় আজ রাতে আমাকে গ্রহণ করতে পারো।

আমি আবারও ওর চোখের জল মুছে দিলাম। তারপর ওর ঠোটে ঠোট রাখলাম। দীর্ঘ চুমুর শেষে ওকে বললাম, না, তা হয় না, তোমার এ ভালোবাসাটুকুই আমার কাছে অনেক দামি। আমি আবার আসবো।

তারপর তরুর ঘুম ভাঙিয়ে দুজনে মিলে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলাম। মীনহী দরজায় দাড়িয়ে রইলো, আমি ফিরে ফিরে দেখেছিলাম ওর করুণ মুখটা।

বাসের আলো জ্বলে উঠতেই একে একে সবাই নড়েচড়ে উঠতে লাগলো। আমার পাশের মেয়েটি জেগে উঠে খুব বিব্রত হয়ে বললো, দুঃখিত, ঘুমিয়ে আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম নিশ্চয়ই!

আমি হেসে জানলাম, নাহ! তবে হ্যা, আপনার চুলের ঘ্রাণটা মনকাড়া।

মেয়েটা একটু লজ্জা পেয়ে হাসলো।

আমি ফোনের ভাজ খুলে কালার ডায়ালে মীনের মুখটা দেখছিলাম।

পাশের মেয়েটা বললো, আপনার বান্ধবী বুঝি?

আমি বিষণ্ন হয়ে উত্তর দিলাম, হ্যা, খুব দুঃখী মেয়ে।

বাসটা যখন ছংজু টার্মিনালে প্রবেশ করলো তখনো বাইরে দারুণ তুষার।

suti77bd@yahoo.com
কোরিয়া থেকে

জার্মানির ইউনিভার্সিটিতে

–মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মৃধা

জার্মানির এক ইউনিভার্সিটিতে একসেপটেনস লেটার হাতে পেয়ে বেশ আনন্দিত হলেও খুশি হতে পারলাম না। কোনো স্কলারশিপ না থাকায় ভাবলাম, সে দেশে গিয়ে চলবো কিভাবে! অন্যদিকে চিন্তা করলাম, স্কলারশিপ ছাড়া জার্মান এমবাসি আমাকে ভিসা দেবে না।

একসেপটেনস লেটারটি হাতে নিয়ে একদিন গেলাম গুলশানে জার্মান এমবাসিতে। ভেতরে ঢুকতে না পারলেও ইনফরমেশন–এ কথা বলে যা বুঝতে পারলাম তা হলো, ছাত্রদের জন্য জার্মান ভিসা পাওয়া খুবই কঠিন। স্কলারশিপ ছাড়া তো আশাই করা যায় না।

বুকের মধ্যে একটি ধাক্কা লাগলো। না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোর ব্যথা যে কতো কঠিন তা জার্মান এমবাসি থেকে গুলশান–২ চক্কর পর্যন্ত ধীর পায়ে হাটতে হাটতে মর্মে মর্মে অনুভব করলাম।

স্মৃতিপটে জাগতে লাগলো অনেক কথা। কতো কষ্ট করে স্রোতের বিপরীতে লেখাপড়া করে আজ এখানে এসেছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স শেষ করেই বিদেশে লেখাপড়ার জন্য লেখালেখি শুরু করেছিলাম। আজ ভাবছি, আমার ভাগ্যে বুঝি বিদেশের লেখাপড়া নেই। অনেকক্ষণ গুলশান–২ চক্করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাড়িয়ে থাকলাম। বিদেশ নামের সোনার তরীর পালটা নামিয়ে ফেললেও হাল ছাড়লাম না, শক্ত করে ধরলাম।

জার্মান ভিসার জন্য আবেদন করলাম। একই সঙ্গে ডিজি অফিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ছুটি এবং ইউনেসকো–র একটি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করে রাখলাম। আগস্ট ২০০০–এর প্রথম সপ্তাহে টেলিফোন করে জানতে পারলাম ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছি। ছুটির অনুমোদন নিয়ে জার্মান এমবাসিতে গিয়ে যখন শুনলাম ভিসাও পেয়েছি তখন কতোটুকু খুশি হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। সমস্ত শরীরে শিহরণ অনুভব করেছিলাম।

অবশেষে এডিবি ভবনে অবস্থিত ইউনেসকো–র ঢাকা অফিস থেকে এক হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক এবং ঢাকা–ব্যাংকক–ফ্রাংকফুর্ট থাই এয়ারওয়েজের একটি টিকেট হাতে নিয়ে রওনা দিলাম জার্মানির উদ্দেশ্য। ব্যাংককে নয় ঘণ্টা যাত্রা বিরতি। ফ্রাংকফুর্ট গিয়ে পৌছালাম পরের দিন সকাল সাড়ে ছয়টায়। ইমিগ্রেশন পার হয়ে ট্রলিতে লাগেজ তুলে গেলাম ট্রেনের টিকেট কাউন্টারে।

টিকেট কাটার কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে পৌছালো। রওনা দিলাম ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে। ট্রেন থেকে নেমে ডিপার্টমেন্টে ফোন করলে দশ মিনিটের মধ্যে এক ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এলেন। নিজ হাতে আমার লাগেজ তার গাড়িতে তুলে আমাকে নিয়ে গেলেন ডিপার্টমেন্টে। পরে জানতে পারলাম তিনিই সেই প্রফেসর যার সঙ্গে আমি গত দেড় বছর যাবৎ যোগাযোগ করেছি।

ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমার জন্য বাসা, রেসিডেন্স পারমিটের কাগজ, ব্যাংকের একাউন্ট, কমপিউটার একাউন্ট ইত্যাদি প্রস্তুত রাখায় শুরু করতে কোনো প্রকার অসুবিধার মুখে পড়তে হলো না।

জার্মান ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী সকল বিদেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য জার্মান ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রথমেই শুরু হলো আট সপ্তাহের জার্মান ভাষার বেসিক কোর্স। ক্লাস নেবেন ড. গুন্ডে কুর্জ এবং সাবিনা। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেমিস্টার পদ্ধতিতে। প্রতিটি সেমিস্টারের মেয়াদ ছয় মাস। আট সপ্তাহের জার্মান কোর্স শেষে আমাদের মূল কোর্স শুরু হলো অক্টোবর ২০০০–এর শেষ সপ্তাহে।

বেশ কয়েক বছর পরে আবার ছাত্র সেজে ক্লাস করছি। তাই আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। এখানে প্রতিটি ক্লাস রুম বেশ সমৃদ্ধ যেখানে আছে প্রজেক্টর, ডাবল মুভিং ব্ল্যাকবোর্ডসহ প্রয়োজনীয়

এপারেটাস। কিন্তু অবাক হলাম ক্লাস রুমে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার দিকে তাকিয়ে। যাদের অধিকাংশই বিদেশি।

এ সম্পর্কে পরে জার্মান শিক্ষিকা ড. গুন্ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে তাদের শিক্ষার স্তর সম্পর্কে যে ধারণা দিলেন তার সারমর্ম এমন – জার্মানিতে শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তিন বছর বয়স পূর্ণ হলেই প্রতিটি শিশু শুরু করে তার কিন্ডারগার্টেন লাইফ। এখানে কোনো একাডেমিক শিক্ষা দেয়া হয় না।

শিশুর বয়স ছয় বছর হলে সে কিন্ডারগার্টেন থেকে যাবে Grundschule (Schule - স্কুল) যেখানে সে চার বছর লেখাপড়া শিখবে। এখানকার শিক্ষা সবার জন্য কমন এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত হবে তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন। তার মেধা, দক্ষতা ও শ্রেণী পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণী শিক্ষকের রিপোর্ট অনুযায়ী সে যাবে পরবর্তী শিক্ষার জন্য।

এখানে রয়েছে তিনটি পথ। যারা Grundschule–এ ভালো পারফরমেন্স শো করতে পারবে না এবং যারা মোটামুটি ভালো করবে তাদেরকে পাঠানো হয় যথাক্রমে Hauptschule এবং Realschule।

Hauptschule–এ পাচ বছর লেখাপড়া শিখে Hauptschuleab schluss এবং Realschule–এ ছয় বছর লেখাপড়া শিখে Mittlere Reife পরীক্ষায় পাস করে পরবর্তী কালে আরো তিন বছরের Ausbildung (বিশেষ শিক্ষা) গ্রহণ করে সরাসরি কর্মজীবনে ঢুকবে।

জার্মানিতে Ausbilbung ছাড়া নরসুন্দরও হওয়া যায় না। আর যারা Grundschule–এ খুব ভালো করে তাদেরকে পাঠানো হয় Gymnasium-এ। এখানে নয় বছর লেখাপড়া শিখে Abitur পরীক্ষায় পাস করে এরা যাবে ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য।

সবাই যেহেতু ইচ্ছা করলেই ইউনিভার্সিটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, তাই ইউনিভার্সিটিগুলোতে জার্মান শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কম।

জার্মানিতে আড়াই বছরের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, প্রতিটি জার্মান সম্পর্কে সময়ানুবর্তী, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল এবং পরিশ্রমী – এ চারটি শব্দ প্রযোজ্য। এখানে সব কিছু চলে ঘড়ির কাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। প্রতিটি ট্রেন এবং বাস স্টপে টাইমটেবল টাঙানো আছে। কোনোদিন দেখিনি একটি ট্রেন বা বাস এক মিনিট আগে বা এক মিনিট পরে আসতে।

এ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়ির চারপাশ বেশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখেছি তারা চকলেট বা ক্যান্ডি খেয়ে এর মোড়কটা পকেটে ঢোকায়। এরা নাক ঝাড়া দিয়ে টিসু পেপারটা পকেটে রাখে। অনেককে দেখেছি সিগারেটের প্যাকেটের শেষ সিগারেটটি মুখে তুলে খালি প্যাকেটটি রাস্তায় না ফেলে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, সামনের ডাস্টবিনে ফেলবে।

জার্মান জাতি খুব সুশৃঙ্খল। দোকান, ব্যাংক বা অফিশিয়াল কাজে কোনো অফিসে গিয়ে দেখেছি একজন সামনে থাকলে পরেরজন তার পেছনে দাড়ায়। লাইনে দাড়ানোই যেন তাদের নিয়ম। জার্মান উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে তাদের পরিশ্রমের ফলে। এরা খুব কর্মঠ এবং নিষ্ঠাবান। ফ্যাকাল্টির ডিনকে দেখেছি, নিজের ব্যাগ নিজে টানতে। এ দেশে পিয়ন, দারোয়ান, বুয়া বা আবদুলদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এ দেশে শিক্ষার মানও যেমন উন্নত তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অগাধ ফ্যাসিলিটিজ। সবচেয়ে বড় সুবিধা, এ দেশে কোনো টিউশন ফি লাগে না। নিজ শহরে বাস এবং একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফৃ। সকলের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার ইন্টারনেট সুবিধাসহ কমপিউটার ব্যবহারের সুবিধা। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিগুলোও সমৃদ্ধ। লাইব্রেরি থেকে বই ধার নেয়ার পদ্ধতিও বেশ চমৎকার। দুনিয়ার সকল আন্তর্জাতিক জার্নাল এখানে পাওয়া যায়।

তবে জার্মানরা অভদ্র ও অসহিষ্ণু হতে পারে।

একদিন থিসিসের কাজের জন্য তিন চারটি IEEE জার্নাল খুজে বের করে লাইব্রেরিতে ফটোকপি করছি। এমন সময় এক জার্মান ছাত্রী এসে আমাকে বললো, সেও ফটোকপি করতে চায়। ইউনিভার্সিটির ফটোকপি মেশিনগুলো কয়েন ঢোকালে সচল হয়। আমি যেহেতু অনেকগুলো কয়েন ঢুকিয়ে ফেলেছি এবং প্রোগ্রাম সেট করে ফটোকপি করছি সেহেতু তাকে জার্মান ভাষায় বললাম, একটু দেরি করো। আমার এখনই শেষ হয়ে যাবে।

তার মনে হয় বেশ তাড়া ছিল। তাই সুযোগ না পেয়ে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। নিচু স্বরে Arschloch বলে প্রকাশ করে চলে গেল।

আমাদের দেশে যেমন সচরাচর *শালা* ব্যবহৃত হয়, জার্মানিতে তেমনি যার আভিধানিক অর্থ asshole।

mdanwarhossain@yahoo.com
কাইজার স্লটার্ন, জার্মানি থেকে

অবিশ্বাস্য

–জসীমউদ্দিন

নারীরা সমুদ্রের মতোই রহস্যময়ী। তবে এ দুটোর এক জায়গায় রয়েছে গরমিল। সমুদ্রের নোনাজলে স্নান করে মানুষ হয় পবিত্র। আর নারীর নোনাজলে স্নান করে পুরুষ হয় পতিত, সমাজকে করে কলুষিত। এ রকম এক রহস্যময়ী নারীর আচরণ বার বার আমার স্মৃতি দর্পণে প্রতিবিম্ব ফেলে। তার তো আমার সঙ্গে রহস্যময় আচরণের কিংবা মিথ্যা ভাষণের কোনো দায় ছিল না। কেন যে সে আমার কাছে মিথ্যা বলেছিল সেই রহস্যটা উন্মোচন করতে গেলে বার বার প্রথম দিনের পরিচয়টাই শুধু মনে পড়ে।

আমি তখন আল আইন শহরের হিলটন রোডের ফুটপাথে দাড়িয়ে আছি। বিকেলে এ সময়টায় আমার দোকানের সামনে দাড়ালে গোধূলি লগ্নটা বেশ উপভোগ করা যায়। সেদিনও আনমনা হয়ে সেটা দেখছি। সে তখন দূর থেকে এসে হিলটন রোড ক্রস করে আমার সামনে দাড়ালো। তার পরনে কালো বোরকা, হাতে দস্তানা, মুখে নেকাব। নেকাবের ছিদ্র দিয়ে শুধু ডাগর কালো চোখ দুটোই দেখা যায়। ভেবেছিলাম কোনো আরব মেয়ে। আমার ভাবনাটা উল্টো করে দিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই ইধার কোই বাংলাদেশি হ্যায়? – ভাই এখানে কোনো বাংলাদেশি আছে কি?

কিউ? ম্যায় ভি এক বাংলাদেশি হু কেন – আমিই তো এক বাংলাদেশি।

ও আচ্ছা, ভালোই হলো, আমি হচ্ছি মিলা।

তাহলে আপনার নাম বুঝি মিলা।

জি, আসল নাম খালেদা মিলা। কষ্ট করে এ চিঠির ঠিকানাটা আমাকে লিখে দেবেন কি? বিশ হাজার টাকার ড্রাফট দেশে পাঠাচ্ছি। ঠিকানাটা সুন্দর ও স্পষ্ট করে লিখবেন। রেজিস্ট্রি করবো।

ঠিকানাটা লেখার ফাকে তার বাড়ি কোথায় জানতে চাইলাম।

সে বললো দাউদকান্দি থানার গোলাপের চরে তার বাড়ি।

স্বামী–সন্তান কিংবা ভাই, কে আছে এখানে? আমার প্রশ্ন।

উত্তরে বললো, স্বামী–সন্তান, ভাই এ দেশে আমার কেউ নেই। শুধু আমি আছি আর আমার আল্লাহ আছে সঙ্গে।

মিলার কথা শুনে তার জন্য আমার অন্তরে মমত্ববোধ জেগে উঠলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেশেও বুঝি কেউ নেই?

সে অবাক করে দিয়ে বললো, দেশে আমার মা–বাবা, ভাই–বোন সবাই আছে। আছে স্বামী এবং ছয় বছরের একটি সন্তান। এই দেখুন বলে হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে বলে এটা আমার সন্তান। আর পাশের লোকটি আমার স্বামী। আমার অবর্তমানে ছেলেটিকে আমার স্বামী খুবই আদর করে। তবুও গত দুই বছরে দুই সেকেন্ডের জন্যও ছেলেটির কথা ভুলতে পারিনি।

মিলার দুই চোখ জলে চিক চিক করে উঠলো। ঠিকানাটা লিখে দিয়ে তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করলাম, দেশে বাবা, ভাই, স্বামী থাকতে আপনি নারী হয়ে কেন প্রবাসে এলেন।

মিলা বললো, সে অনেক কথা। সবই আমার কপালের লিখন। বিয়ের সময় কুয়েতে আমার স্বামীর তার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারে একটা গ্রোসারি দোকান ছিল। বিয়ের পর আমার স্বামী নতুন স্ত্রীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তার পার্টনারকে দোকান চালানোর দায়িত্বটা দিয়ে পর পর দুইবার দেশে আসে। এরই মধ্যে তার পার্টনার সমস্ত টাকা–পয়সা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা হলো। আর কুয়েতে ফিরে পার্টির দেনা শোধ করতে গিয়ে আমার স্বামী দেউলিয়া হয়ে গেল। এক সময় দোকানটাও হাতছাড়া হলো এবং সে হলো মানসিক ভারসাম্যহীন। কিছুকাল সেখানে কাটানোর পর আমার স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেশে ফিরে গেল। অনেক চিকিৎসার পরও তার মানসিক অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। এভাবে দুই বছর যেতে না যেতেই বিপন্ন বেকার স্বামী, সন্তান এবং আমার জায়গা হলো না শ্বশুরবাড়িতে। এক সময় স্বামী–সন্তান নিয়ে নিজের পৈতৃক বাড়িতে উঠি।

এভাবেই শুরু হলো মিলার সংগ্রামী জীবন। বেচে থাকার জন্য তাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। দৃপ্ত শপথ নিয়ে সংসারের হাল ধরে মিলা নিজ পায়ে দাড়াতে চায়। কঠোর জীবনযুদ্ধে তাকে জয়ী হতেই হবে। এক সময় মিলা পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে এবং কিছু টাকা ধার নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসে পৌছে। এখানে তিনটা আরব পরিবারে তিনবেলা হাউসমেইড হিসেবে পার্টটাইম কাজ করে যা পায় তাতে নিজের খরচ বাদ দিলেও মাস শেষে বাংলাদেশি দশ বারো হাজার টাকা তার হাতে জমা হয়। দুই তিন মাস পর পর মিলা সেই টাকা দেশে পাঠিয়ে দেয়। তার স্বামীও এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। পারিবারিক দৈন্যতা এখন অনেকটাই কেটে গেছে।

কথায় কথায় মিলা আরো জানালো, এ দেশে এসেও নারীলোভীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজের আব্রু বাচাতে গিয়ে তাকে প্রতিটি পদক্ষেপ হিসাব করে ফেলতে হয়।

মিলার সংগ্রামী ও নিষ্পাপ জীবনের কাহিনী শুনে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জন্মালো। তাকে বললাম যে কোনো সময়, যে কোনো অসুবিধায় পড়লে সে যেন আমার সহযোগিতা নিতে সংকোচ না করে। মিলা সেদিন আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেল।

মাস খানেক পরে সে আবারও এলো। সেই আগের বেশে। আজ মিলাকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল মনে হলো।

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, তার স্বামী এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমাকে স্বামীর কাছে দুই কলম চিঠি লিখে দিতে বললো।

তার কথা মতো লিখলাম –

প্রিয়তম,

তোমার মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে জেনে আমার আনন্দের সীমা নেই। প্রতিক্ষণে তোমাকে ও খোকনকে মনে পড়ে। এখানে দিনগুলো কাটে আমার কর্মব্যস্ততায়। রাতগুলো কাটে অনেক কষ্টে। আজ দুই বছর এখানে তোমার সান্নিধ্য ছেড়ে পড়ে আছি শুধু অনাগত জীবনটা সুখে কাটানোর জন্য। আশা করি অচিরেই আমরা সুখের নাগাল পাবো। অচিরেই আবার তোমার বুকে ফিরে আসবো। খোকনের বয়সটা তো ছয় বছরে পড়লো। তাকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দিও।

– ইতি মিলা

চিঠি নিয়ে চলে যাওয়ার সময় মিলাকে চা খেতে অফার করলাম।

সে বললো, আজ নয়, অন্যদিন এসে খেয়ে যাবো। যাওয়ার সময় মিলা আমাকে তার বাসায় যেতে আমন্ত্রণও জানালো।

দুই মাস পরে মিলা আরো একবার এলো। তার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ড্রাফট। এতো টাকার ড্রাফের দিকে আমার চোখ পড়তেই সে বললো, দুই তিন মাসে তার জমানো টাকা এবং তার ফিলিপিনো রুমমেট থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে এ ড্রাফটা বানিয়েছি।

চিঠিতে লিখতে বললো এ টাকা দিয়ে তার স্বামী তাদের বাড়ির চালাঘরটা মেরামত করে সেখানে যেন একটা চা, সিগারেট ও মনোহরী দোকান দেয়।

মিলা ভাগ্যের সিড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। আজ সে বোরকার নেকাব কিছুই পরেনি, হাতে নেই দস্তানা। সালোয়ার কামিজ পরে একহারা গড়নের উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী মিলা আমার সামনে দাড়িয়ে আছে। যৌবনের চ্ছটা তার চেহারা ও দেহ থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। এমন আগুন ঝরা যৌবনই তার শত্রু হয়ে দাড়িয়েছে। এর জন্য তাকে প্রতি পদে, প্রতিক্ষণে যুদ্ধ করতে হচ্ছে আব্রু বাচাতে। ধন্য মিলা, ধন্য। এবার সে হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটা চকোলেট বের করে আমার সামনে রেখে বললো, বাসায় তো কোনোদিন গেলেন না। তাই এগুলো আপনার জন্য নিয়ে এলাম।

তার মুগ্ধ, মায়াবী চোখের দিকে তাকিয়ে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারিনি। যাওয়ার সময় সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললো, আবার দেখা হবে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। রাত তখন বারোটার কাছাকাছি। শুয়ে শুয়ে টিভিতে একটা ছবি দেখছি। এমন সময় ঝড়ের বেগে আমাদের এলাকার ছেলে নিয়াজ রুমে ঢুকলো। হাপাতে হাপাতে সে যা বললো তার সারমর্ম এই যে, তার বড় ভাই এখানে একটা সরকারি চাকরি করে। আজ দুই বছর যাবৎ এখানে একটা বাংলাদেশি মেয়েকে মৌখিকভাবে বিয়ে করে একত্রে স্বামী–স্ত্রীর মতো বসবাস করছে। দেশে ফেলে আসা তার স্ত্রী, পুত্র–কন্যা সবাইকে ভুলে এ মেয়েটার পেছনে নিজের উপার্জিত টাকার সবটাই ওড়াচ্ছে। নিয়াজ তার বড় ভাইকে ইঙ্গিতে অনেক বুঝিয়ে–সুঝিয়েও এই পুরুষখেকো নারী থেকে আলাদা করতে পারেনি। অগত্যা আজ তার ভাই ও সেই মেয়েটাকে রুমে একত্রে যৌন লীলারত দেখে রুমটা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আমাদের ডাকতে এসেছে। আমরা যেন তার নির্লজ্জ বড় ভাইটিকে এমন পাপাচার থেকে ফিরে আসতে দুই চারটা কথা শুনিয়ে দিই।

তাই আমাদের মিরসরাই থানার লোক। এমন অনৈতিক কাজ থেকে ফিরিয়ে এনে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং সংসারের প্রতি মনোযোগী হতে দুটো উপদেশ দেয়ার জন্য আমার বিবেক বোধ জেগে উঠলো। সহসা দুই তিন বন্ধুসহ নিয়াজের সঙ্গে তার ভাইয়ের রুমে যাই। তালা খুলে ভেতরে যেতেই চমকে উঠি। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অবিশ্বাস্য, অথচ চরম সত্যটি চোখে দেখে এক পলকও সেখানে দাড়াতে আর মন চাইলো না। দরজার পাশে নির্লজ্জের মতো দাড়িয়ে রয়েছে নিয়াজের ভাই।

খাটের কোণায় বিবসনা যাকে দেখলাম সে আর কেউ নয়, মিলা। আমার প্রিয় মিলা! আমাকে দেখে এক হাতে মুখ ঢেলে নিল। অন্য হাতে নিচু হয়ে আব্রু ঢাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

ছয় মাস আগে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার পর থেকে মিলা আর কোনোদিন আমার দোকানে আসেনি।

তবে কোরবানির ঈদের দিন নিয়াজের মুখে শুনলাম, মিলা ও তার ভাই বাসা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় রাত যাপনকালে এ দেশের গোয়েন্দা পুলিশ ঈদের মাত্র দুই দিন আগে তাদের বাসায় হানা দেয়। চতুর মিলা আরব মেয়ের বেশ ধরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নিয়াজের ভাই।

এ কাহিনী যখন লিখছি তখনো সে জেলে রয়েছে।

আল আইন, ইউএই থেকে

কিউ গার্ডেনে একদিন

–হেলেন আহমেদ

বার্ধক্যের প্রধান লক্ষণ স্মৃতিচারণ করা। আজ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এটা যেন গতকালের ঘটনা।

বিয়ের পর প্রথম সংসার পাতলাম লন্ডনে। একদিন বন্ধুরা বললেন, দুই বছর ধরে লন্ডনে আছেন, অথচ এখনো কিউ (Kew) গার্ডেন দেখতে গেলেন না।

সত্যি যাই যাই করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শেষে একদিন ঠিক করলাম পরদিন কিউ গার্ডেনে যাবো। সকালে মেয়েকে নার্সারিতে পৌছে দিলাম। এই নার্সারিতে ছয় মাস থেকে দুই বছরের বাচ্চাদের সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল পাচটা পর্যন্ত রাখে। বিশেষ ক্ষেত্রে সাড়ে পাচটা পর্যন্ত রাখে। এর চেয়ে বেশি দেরি হলে মেট্রনের বকুনি খেতে হয়।

আমাদের এলাকা থেকে কিউ গার্ডেন দেড় থেকে দুই ঘণ্টার পথ। তাই ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই ঠিক করে নিলাম তিনটার সময় কিউ গার্ডেন থেকে বের হবো। সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে কিউ গার্ডেনে এলাম।

এখানে পৃথিবীর সব দেশের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, ফল, ফুল গাছ রয়েছে। নানান রকম ফল ফুলের গাছ, সবজি দেখে ভালো লাগলো। প্রত্যেকটা গাছের গায়ে কোন দেশের কোন প্রজাতির গাছ তা লেখা আছে। ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) গাছপালার এলাকায় এলাম। এতো ভালো লাগলো নিজের দেশের নানান রকম ফল-ফুল, সবজি এবং অন্যান্য গাছ দেখে। বিশেষ করে আমার প্রিয় লাউ দেখে। মুহূর্তের মধ্যে যেন দেশে ফিরে গেলাম। যে করল্লা আজও আমি কুইনাইনের মতো গিলে খাই সেই করল্লা দেখে মনে হচ্ছিল গার্ডের অগোচরে দুটো ছিড়ে নিয়ে যাই, বাসায় গিয়ে ভাজি করবো।

কখন যে তিনটা বাজলো বুঝতে পারিনি। স্বামী বললেন, চলো এবার ফেরা যাক।

আমরা কিউ গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বেরিয়ে এসেই বুঝলাম ভুল করেছি। আমরা বেরিয়েছে টেমস নদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেই গেট দিয়ে। এদিক দিয়ে সাধারণত লোকজন বেশি যাতায়াত করে না, বাসও চলে না। তখন আবার ঢুকে আমরা যে গেট ঢুকেছিলাম সেটা খুজতে গেলে আরো দেরি হবে। আমরা নদীর তীর দিয়ে হাটতে থাকলাম। টেমস-এর ওপর দিয়ে ছোট ছোট স্টিমারে নৌবিহারে অনেক লোকজন। তারা আমাদের হাত নেড়ে টা টা দিচ্ছিল। আমি সেদিন নতুন জুতো পরে বেরিয়েছিলাম। কিউ গার্ডেনে হাটতে হাটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি হাটতে পারছিলাম না। তিনি রেগে যাচ্ছিলেন। শেষে জুতা খুলে খালি পায়ে হাটতে শুরু করলাম।

সেদিন পথচারীরা সকৌতুকে একটি দৃশ্য দেখছিল, একজন লম্বা সুদর্শন পুরুষ হেটে যাচ্ছেন বাসস্টপের দিকে এবং তার প্রায় একশ গজ পেছনে শাড়ি পরা ছোট-খাটো এক মহিলা খালি পায়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাটার চেষ্টা করছে।

অবশেষে বাসস্টপে এলাম। কিন্তু ভুল গেট দিয়ে বের হওয়ার জন্য আমরা যেখানে এলাম সেখান থেকে আমাদের এলাকায় যেতে দুইবার বাস বদলাতে হবে। কি আর করা! বাসের লাইনে দাড়ালাম। প্রথম বাসটায় উঠতে পারলাম না। দ্বিতীয় বাসটার কন্ডাক্টর বললো, কেবল একটা সিট আছে। তাই আমরা সরে দাড়ালাম। আমাদের পেছনের লোক বাসে গেল। এদিকে চারটা বাজে। নার্সারিতে সাড়ে পাচটার আগে পৌছাতে হবে।

ওনাকে বললাম, তুমি চলে যাও, আমি পরের বাসে যাবো।

তিনি বললেন, তুমি ঠিক মতো যেতে পারবে তো?
বললাম, পারবো।
পরের বাসেও একটা সিট ছিল, তিনি চলে গেলেন। আমি যখন বাসায় পৌছালাম তখন সাতটা বাজে। দেখি তিনি মেয়েকে নিয়ে বাসায় এসেছেন। মুখ ভার। বললেন, ছয়টায় পৌছেছি, দেখি মেট্রন নিজেই পেরামবুলেটারে তাকে নিয়ে আমাদের বাসার দিকে আসছে, খুব বকলো। সারা দিনের ভালোলাগাটা এক মুহূর্তে খারাপ হয়ে গেল।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

ভালোর মাঝে খারাপ

–ইরফান শামসুদ্দিন

উপমা ও স্বপ্ন দিয়ে কবি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বিজ্ঞানীর কাছে। বিজ্ঞানীর নিরলস চেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে আবিষ্কার হয় নতুন নতুন শিল্প। বাস্তবায়িত হয় কবির সব আজব স্বপ্ন। ফলে মানুষের জীবন হয় অধিক বৈচিত্রময়, ভোগ্যময়। মানুষের আরাম–আয়েশ ও সুখের জন্য এ শিল্প। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে এ শিল্প, শিল্পের জন্য মানুষ নয়। অথচ জাপানে হয়েছে তার উল্টোটা।
খনিজসম্পদে খুবই দুর্বল এ দেশটি একমাত্র শিল্পকে পুজি করে বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে।
জাপানিজ ভাষায় *ইসসোকামে গাম্বাত্তে* বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এর অর্থ, *মনোযোগের সঙ্গে* পরিশ্রম করা। এ একপেশে মনোযোগের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রমই জাপানিজদেরকে কোনো কোনো বিষয়ে অমনোযোগী করে তুলেছে। অধিক শ্রমে তারা শিল্প উন্নত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে।
এটা কি তাদের অজ্ঞতা, নাকি এক ধরনের *হেকরামি* তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এরা অনুকরণ প্রিয়। বিশ্বের যে কোনো দেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত শিল্প, সংস্কৃতি, গান, স্টাইল ইত্যাদি এরা খুব দ্রুতই গ্রহণ করে পরিণাম যাই হোক না কেন। তবে ইওরোপ, আমেরিকাকে অনুকরণ করে জীবনের পরম সাধনা হিসেবেই। কথায় আছে, *আমেরিকায় জ্বর এলে কাথা গায়ে দেয়া হয় জাপানে।*
ইওরোপ, আমেরিকায় গায়ের জামা–কাপড়, গান, চুলের কাটিং ইত্যাদি স্টাইল খুব গবেষণা করেই বের করা হয়। এবং এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হলেও বেশ মানানসই যেটা তাদের দৈহিক গড়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়াতে বেশ ভালোই লাগে।
নিহোনজিনরা (জাপানিজরা) অন্যরকম দৈহিক গঠন নিয়ে যখন ইওরোপ, আমেরিকার কোনো স্টাইল অনুকরণ করতে যায় তখন ব্যাপারটা খুব হাস্যকর মনে হয়।
কিছুদিন আগে আঠারো বিশ বছরের ছেলেদের পরনে এক ধরনের প্যান্ট দেখলাম। জোড়াতালি দেয়া অনেক পকেট বিশিষ্ট প্যান্টগুলো এমনভাবে পরা হয়েছে যেন এক্ষুণি কোমর থেকে খুলে পড়ে যাবে। এদিকে পায়ের কাছে প্রায় আট দশ ইঞ্চি কাপড় ঝুলে আছে বোধহয় রাস্তার ধুলো–বালি পরিষ্কারের জন্য। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা খেলাস্থল থেকে প্রচণ্ড টয়লেটের চাপ নিয়ে প্যান্ট আধা খোলা অবস্থায় সাবধানে যেভাবে গন্তব্যে যায় অনেকটা সে রকম।

তারও বেশ কিছুদিন আগে দেখলাম স্কুল–কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের গলায় লোহা, তামায় মোটা শিকল। এটা অনেক সময় *অ্যালসেশিয়ান* কুকুরের গলায় দেখা যায়। ইদানিং দেখছি, মুখের নিচের ঠোটের কোণায় আস্ত একটা অতি ছোট্ট আলপিনের গোড়া বসানো। এটা এমনভাবে ঠোটে গেথে রাখে যেন কিছুক্ষণ পর পর জিভের স্পর্শ নেয়া যায়। এটা নাকি প্রথম প্রেমের রাগে অবস্থান করার লক্ষণ! মাথার চুল আর দাতের কথা না–ইবা বললাম। শুনেছি, এখানকার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা নাকি নাভির নিচের লোম সহজে কাটে না। খুব বড় বড় রাখতে অভ্যস্ত।

আসলে এগুলো অতিরিক্তের, অস্বাভাবিকতার প্রতিক্রিয়া। হেচড়ানো প্যান্ট, নাভির নিচের বড় বড় লোম এবং ঠোটে আলপিনের গোড়া এসব স্টাইলের তথাকথিত অনুকরণ মনে হলেও আসলে এসবের মাধ্যমে তারা অস্বাভাবিকতার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে মাত্র। এতে কে কি ভাবলো, কেমন দেখালো, তাতে কি!

বেশ কয়েক বছর যাবৎ জাপানে থেকে তাদের এই উদাসীন দিশেহারা ভাবের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে জাপানের মতো ধনী দেশে যারা আছে তাদের সঙ্গে একটা মিল খুজে পেয়েছি। মেঘ না চাইতে বৃষ্টি অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাড়ায়।

প্রথমে মনে হয়েছিল জাপানে গিয়ে প্রচুর অর্থ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ভাত কিনে রাখবো ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু পেটের ক্ষিধে মিটে মানসিক ক্ষিধে যে প্রকট হবে বুঝতে পারিনি।

দশ বারো লাখ টাকা খরচ করে ভাতের জন্য কামলা দিতে এখনো লোক জাপান আসছে। ভাতের নিশ্চিত সনদপত্র জোগাড়ের নামে প্রবাসী হয়ে কেউ কেউ বৌ, বাচ্চা, সংসার থেকে আসলে পালাচ্ছে। এখানে সবই সহজে পাওয়া যায়। এই সহজলভ্যতাই সুন্দর জীবনগুলোকে ড্যাম কেয়ারের দিকে অনবরত ঠেলে দিচ্ছে। এমনো শোনা গেছে, দশ বারো লাখ টাকায় জাপান এসে কোনোমতে চালান হয়তো উঠেছে, তারপর থেকেই মদ, নারী, জুয়া, স্ন্যাক, বার ইত্যাদি তাকে বাচিয়ে রেখেছে শুধু শ্বাস–প্রশ্বাস দিয়ে। আল্লাহর বিশেষ রহমতে মুষ্টিমেয় কিছু লোক অর্থকড়ি, মা–বাবা, বৌ–বাচ্চা নিয়ে হয়তো ভালো আছে।

জাপানে সব কিছুই চলে ঘড়ির কাটা ধরে। যে যাই কাজ করুক না কেন, এতো বেশি বেতন পাবার মতো বংশের লোক আমরা নই। মাত্র পাচশ টাকার সমস্যায় লাখ লাখ টাকা হাতে পাচ্ছি। অনেক বাস্তব কারণে সময়োপযোগী মায়ের আদর আর বৌয়ের বিশেষ অর্থবোধক হাসি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ফলে আমরা আমাদের অজান্তেই অজানা এক মানসিক অসুস্থতায় ভুগছি। আমাদের দেশের সীমিত আয়ুর লোকদের হয়তো অনেক কিছুই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর সময় ও মাত্রা নির্বাচনে সামান্য হেরফের হলেই জীবনের বারোটা বাজতে আর বাকি থাকে না। তাই অধিক বঞ্চিত অধিক প্রাপ্তির পার্শ্বপ্রক্রিয়াও খুব গুরুতর হয়।

মানুষের উচিত, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সীমিত আয়ুর এ জীবনটাকে আরো সুস্থ, সুন্দর ও অর্থবহ করে গড়ে তোলা। তাতে অন্ততপক্ষে কোনো কিছুর অতিরিক্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় যেন সুস্থ মাথাটা খোয়া না যায়।

জাপান থেকে

সবুজ পতাকা

–মোহাম্মদ মোহসীন ভূঞা

ছল ছল চোখে সিমাঙ্কি বসেছিল। তার ফর্শা মুখ ফ্যাকাশে আর নাকের ডগা ক্রমেই লাল হচ্ছিল। কফি এগিয়ে দিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই চোখ গড়িয়ে পানি এলো। নিজেকে সংযত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালো, গতকাল অস্ট্রিয়ান ইমিগ্রেশন দফতর থেকে চূড়ান্ত চিঠি এসেছে পোল্যান্ডের নাগরিকত্ব সমর্পণ করে অস্ট্রিয়ান নাগরিকত্ব নেয়ার জন্য। স্বামীর রেসিডেন্স পারমিট ও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আবেদন করার সময় মনে হয়নি নিজ দেশের অধিকার ছেড়ে দেয়া কতোটা বেদনার।

আমার দিকে ঝুকে এসে কান্না জড়ানো গলায় বললো, তুমি কি কল্পনা করতে পারো, যে দেশে জন্মেছি, যে গ্রামে বড় হয়েছি, যার আলো–বাতাস আমাকে সজীব করেছে, বাবার হাত ধরে খোলা মাঠ পেরিয়ে যে নদীর পাশ দিয়ে উচ্ছলতায় হেটে গিয়েছি সেখানে যেতে হলে আমাকে ভিসা নিতে হবে?

ইনডিয়া বিভাগের পর আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আর ইসরেলি আগ্রাসী অক্রমণে প্যালেস্টাইনিরা যেভাবে নিজ ভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, তাদের বেদনার সঙ্গে সিমাঙ্কির কষ্টের তুলনা চলে না।

প্রিয়জন, প্রিয়বস্তু হারানোর অনুভূতি কম বেশি সবার জানা। কিন্তু দেশ হারানোর সহানুভূতি কি হতে পারে? সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলেছি, সুন্দর জীবনের উদ্দেশ্যে তার নিজ পাসপোর্ট ত্যাগ ও ভিসা নিয়ে পোল্যান্ডে যাওয়া শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। এর চেয়ে বেশি আর কিইবা বলা যায়। তাছাড়া আমিও এ দেশি পাসপোর্ট পাওয়ার আবেদন করেছি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা এবং আমাদের ক্ষমতা অন্ধ রাজনৈতিক নেত্রীর বদৌলতে প্রবাসীরা কতোটা হেনেস্তা হচ্ছে সেটা কারো অজানা নেই। দেশ পরিচালনা যারা করবেন তারা যেখানে ব্যস্ত থাকেন নিজ সন্তানের বিদেশে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টায় সেখানে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ ভাবার সময় কোথায়।

গাড়িচালক থেকে শুরু করে ইমিগ্রেশন কর্তারা দেশে আসা–যাওয়ার পথে যেভাবে অভ্যর্থনা জানায় তাতে মনে হবে, প্রবাসী মাত্রই অপরাধী। তাদের লোলুপ চোখ শরীরে কাটা ধরায়। মহাকর্তারা রিভলভিং চেয়ার আর বছরে একবার ঝটিকা অভিযানে সময় কাটান।

আমাকে যখন দেশের পাসপোর্ট ফেরত দিতে বলা হবে সে সময়ের অনুভূতি কেমন হবে জানি না। লাল–সবুজ পতাকার দেশের সবুজ পাসপোর্টটি হয়তো ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের লাল পাসপোর্টে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু সবুজ দেশের রক্তের রঙয়ে আকা সূর্যের রঙ হৃদয়ে লাল ক্ষত হয়ে থাকবে আজীবন।

ভিয়েনা থেকে

চায়নিজ

– জীবন

১৯৯৭ সালে বেলজিয়ামে আসি এম.এস করার জন্য হিউম্যান ইকোলজিতে। আমাদের ইউনিভার্সিটিটা ছিল ব্রাসেলসে। নাম Vrije ইউনিভার্সিটি। আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর আরো তেতাল্লিশ দেশের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করতো।

আমাদের সাবজেক্টটা যেহেতু পরিবেশ সম্বন্ধীয় সেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে সব ধরনের সাহায্য–সহযোগিতা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং ইউনেসকো থেকে পেতাম। অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টটা চলতো এ দুই অর্গানাইজেশনের সাহায্যে।

ওই বছর আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক–এর জন্য স্কটল্যান্ডে যাবার সিদ্ধান্ত হলো। এই ফিল্ড ওয়ার্কে আমাদের নাম্বার ছিল। ইওরোপের অন্যান্য দেশে যেতে ভিসা লাগতো না। শুধু ভিসা লাগতো বৃটেন যেতে। তাই আমরা সবাই ডিপার্টমেন্ট–এর নির্দেশ অনুসারে ভিসার জন্য বৃটিশ এমবাসিতে আবেদন করেছি। এর মধ্যে ক্যামেরুনের মুবু–কে এবং ক্যারিবিয়ানের রুবি–কে ভিসা দিল না।

আমি ভিসার জন্য আবেদন করলাম সকাল নয়টায়। দুপুর বারোটা আমাকে ভিসা কনসুলারের রুমে ডেকে নিল। আমাকে বিভিন্ন প্রশ্নের পর বললো, আমি চায়নিজ। বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে এখানে এসেছি।

এই কথা শুনে আমার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কি বলে! বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের পর আমাকে বললো, তারা বৃটেনে আমার পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠাবে, এরপর আমাকে জানাবে।

আমি হলে চলে এলাম। ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করলাম না। দেখি তারা কি করে! প্রায় পনেরো দিন পর তারা আমার নামে চিঠি পাঠালো তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। গেলাম বৃটিশ এমবাসিতে।

এবার আরেক ইংরেজ আমাকে আবার জেরা আরম্ভ করলো।

এক পর্যায়ে বললাম, তোমাদের ভিসা আমার দরকার নেই। I fuck your visa।

আমার মেজাজটা এতো খারাপ হলো যে, ইচ্ছা করছিল শালাকে একটা ঘুসি মারি। আবার চিন্তা করলাম, এটা আমার দেশ না।

সে আমাকে বললো, তোমার পাসপোর্ট আমরা দেবো না।

বললাম, আমার পাসপোর্ট রাখার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। অনেক তর্কাতর্কির পর চলে এলাম। পাসপোর্ট তারা আমাকে দিল না। আমি ডিপার্টমেন্টের কো–অর্ডিনেটরকে ব্যাপারটা জানালাম।

তারপর আমার হলের মনিরভাই, এনামভাইকে নিয়ে বাংলাদেশ এমবাসিতে গেলাম। অ্যাম্বাসাডরকে সব বিস্তারিত খুলে বললাম। তখন এমবাসাডর ছিলেন খায়রুল আনাম। তিনি এমবাসির ফার্স্ট মিনিস্টারকে পরের দিন পাঠালেন বৃটিশ এমবাসিতে আমার পাসপোর্ট ফেরত আনার জন্য। আমার পাসপোর্ট দিল না। বললো পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য বাংলাদেশে পাঠাবে।

বললাম, ভেরি গুড। তবে পাসপোর্ট–এর ফটো কপি পাঠান। অরজিনাল পাসপোর্ট পাঠাবেন না।
আমার কথা সে শুনলো না। ছয় মাস পার হলো, পাসপোর্ট–এর ভেরিফেকশনের কোনো খবর এলো না। এদিকে আরেক বিপদ, রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে আমাকে কল করেছে দেখা করার জন্য। রেজিস্ট্রেশন অফিসে গেলাম। মারিয়া নামে এক ভদ্র মহিলা আমাকে বললো, বৃটিশ এমবাসি তোমার নামে কমপ্লেইন করেছে। তোমার কি পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেট আছে?
বললাম আছে। তোমাকে আমি এক সপ্তাহ পরে দেখাবো। পরের দিন এমবাসাডর–এর কাছে গেলাম। তিনি একটি নতুন পাসপোর্ট দিলেন। কিন্তু ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো আমার সেই পাসপোর্ট–এর খবর এলো না।
এক সপ্তাহ পর আমার হাই স্কুল থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সব সার্টিফিকেটের অরজিনাল কপি তাকে দেখালাম এবং নতুন পাসপোর্টটা দিলাম। আমার সব অরজিনাল কপির ফটোকপি করে রেখে তিনি বিদায় দিলে বললেন, কোনো প্রকার সমস্যা হলে আমাকে জানিও।
রেজিস্টার অফিসের সেই মারিয়া আমাকে মানসিকভাবেও সাহায্য করেছেন। এভাবে প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ একদিন দেখি রেক্টর আমাকে দেখা করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি নির্দিষ্ট তারিখে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেই পুরনো গল্প। রেক্টর-এর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা আমার বিস্তারিত বললাম।
আমি বাংলাদেযিশ পুলিশ ভেরিফিকেশন দিলাম। আমার নতুন পাসপোর্ট, অরজিনাল সার্টিফিকেট। এছাড়া বেলজিয়াম এমবাসি আমাকে যে ভিসার জন্য চিঠি দিয়েছে তা এবং বেলজিয়াম ফরেন মিনিস্ট্রি আমাকে যে ভিসা ইসু করেছে তার প্রমাণ। রেক্টর সব কিছু শুনে–দেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা করো না, ঠিকমতো লেখাপড়া করো।
এই দিকে আমিও ইউনিভার্সিটির ল'ইয়ারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম বৃটিশ এমবাসির বিরুদ্ধে কেস করার জন্য। অন্যান্য বন্ধুরা নিষেধ করলো। বেলজিয়াম ছাড়ার আগে একবার এমবাসাডর–এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, আমার পুরনো পাসপোর্ট। কিন্তু না, প্রায় দেড় বছরেও পাসপোর্ট এলো না। মনে মনে ভাবলাম হয়তো এটা বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে। অথচ এ জন্য এমবাসাডরকে কিছু কড়া কথা শুনতে হয়েছে।
আমাদের গায়ের রঙ দেখলে জানি তারা সন্দেহ করে সব কাজে। কিন্তু বাংলাদেশি থেকে চায়নিজ করে সেটা আমার জানা ছিল না। এখনো মাঝে মধ্যে বন্ধুরা আমাকে *চায়নিজ* বলে ঠাট্টা করে। মনে মনে ভাবি, শালার ইংরেজ, দুইশ বছর শাসন করেও বাঙালি আর চায়নিজ চিনলে না!

মন্ট্রিঅল, কানাডা থেকে

দাম

– রূপা

শুভ্রকে আমি ভালোবাসি। প্রায় চার বছরের সম্পর্ক আমাদের। গ্র্যাজুয়েট হয়ে একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করে। বেতন কম। আজকাল যে দেশে চাকরি সোনার হরিণ সে দেশে পাস করেই

চাকরি পাওয়া সহজ কথা নয়। আমার ভালোবাসার মানুষটির মামা–খালুর জোর নেই। নিজের যোগ্যতা বলেই চাকরিটা পেয়েছে।
দুজনের কতো স্বপ্ন ছিল যে, চাকরি পেলেই ঘর বাধবো দুজনে। কিন্তু সে স্বপ্ন আজ ভেঙে খান খান। কারণ স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে মেয়ে দিতে চান না কোনো মা–বাবাই, আমার মা–বাবা ও তার ব্যতিক্রম নয়। তারা তাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত নন–ম্যাট্রিক এক ছেলের সঙ্গে। আমি একটা বিচার করতে পারছি না, কার দাম বেশি? গ্র্যাজুয়েট পাস একজন স্বল্প আয়ের মানুষ, নাকি অশিক্ষিত টাকাওয়ালা প্রবাসীর?

ইব্রাহিমপুর, ঢাকা থেকে

একূল ওকূল

– তামান্না হোসেন

আমি যেদিন ক্যানসাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌছি তখন স্থানীয় সময় রাত এগারোটা। অসম্ভব ক্লান্ত। থাই এয়ারওয়েজে ব্যাংকক–এ অবস্থান করে সিয়াটল, কলারাডো দুইবার প্লেন বদলিয়ে ক্যানসাস সিটি এবং সেখান থেকে আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ করে যেতে হবে ম্যানহাটান নামে একটা ছাত্র শহরে। সেখানে আমার স্বামী মাস্টার্স (এম.এস) প্রোগ্রামে পড়ছেন।
সব সময় বইতে পড়েছি, ওয়াশিংটনের রাজধানী সিয়াটল, রকি মাউন্টেনের কলারাডো, আমেরিকার শষ্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ক্যানসাস। কিন্তু কখনো ভাবিনি এই শব্দগুলো এক সময় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।
কৃসমাসের মাত্র ছাব্বিশ দিনের ছুটিতে আমার স্বামী দেশে গেল বিয়ে করতে। দুই পরিবারের মাধ্যমেই দুজনের দেখাদেখি হওয়ার আগেই আমাদের এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিয়ে। সে রিটার্ন টিকেট নিয়ে গিয়েছিল তার জন্য। একই ফ্লাইটে আমার জন্য টিকেট না পাওয়াতে এক সপ্তাহ পরে আমি রওনা হলাম।
যখন রওনা হলাম, প্লেনে চাপলাম তখনো দেশ ছেড়ে যাওয়ার অনুভূতিটা প্রগাঢ় হয়নি। তবে অসম্ভব কাদছিলাম। শুধুই কান্না। আমার এতো আপন মানুষের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি? কে আছে ওইপারে?
একদম একা ওই লম্বা জার্নির ব্যাংককের এক রাত, সিয়াটল, কলারাডো কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে, প্রতিটি এয়ারপোর্টে, প্লেনের ভেতর যাত্রীদের প্রায় অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমার দুই হাত ভর্তি এতো নকশা কিসের? আমার বিয়ের পনেরো দিনের দিন ছিল ওই যাত্রা। ফলে আমার দুই হাত ভর্তি ছিল মেহেদির রঙ–এ রঞ্জিত।
যখন ছত্রিশ ঘণ্টা জার্নি শেষ করে রাত এগারোটায় ক্যানসাসে পৌছালাম তখন আমি বিধ্বস্ত। আমার স্বামী আমাকে আগেই জানিয়েছিল যে, তার আসতে একটু দেরি হবে। কারণ তার ক্লাস শেষ হবে রাত আটটায়। তারপর তাকে আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ করে আসতে হবে। আমি বসে বসে ঝিমুচ্ছি। কোথায় আছি কোনো বোধ নেই। এয়ারপোর্ট এক প্রকার খালি। হঠাৎ চোখ গেল আমার সুটকেস

দুটো লাগেজ বেল্টে ক্রমেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য কোনো ব্যাগ বা সুটকেস নেই আশপাশে। আমি হাত বাড়িয়ে সুটকেস দুটো নামালাম। ওরে বাবা! সে কি বিশাল, সে কি ভারী। তখনই মনটা হু হু করে উঠলো। এটাই কি বিদেশ? এটাই কি প্রবাস। একা একা বসে আছি। আছে চোখ ধাধানো আলোর ঝলকানি। কিন্তু নেই আপন দেশের কোনো ছায়া, কোনো মায়া।

শুরু হলো স্বজনহীন পরিবেশে দুজনের পথচলা। চল্লিশ হাজার বসতির ছোট্ট এই ছাত্র শহরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের তিনজন মাত্র বাঙালি শিক্ষকসহ পনেরো জন ছাত্রছাত্রী। আমার স্বামী ক্লাসে চলে গেলে সে কি দুঃসহ লাগতো তা বোঝানো যাবে না। চারপাশ ছবির মতো, শান্ত স্নিগ্ধ। ঘরের বাইরে সারি সারি গাড়ি দাড়ানো খেলনা গাড়ির মতো। হেটে যাচ্ছে এমন কাউকে দেখা যায় না। আমার তো অফুরন্ত সময়। সারাক্ষণই আমার চোখের সামনে দুলে দুলে ভাসে আমার বন্ধুরা, অফিস, বাসার সবাই, পাড়ার দোকানদার, ভিক্ষুক, ফেরিওয়ালা আরো অনেক কিছু। আমি অনবরত শুধু কাদি। চাতক পাখির মতো মেইলম্যানের অপেক্ষায় থাকি কখন আসবে। এলে ছুটে যাই। আমার চোখ খুজে ফিরে লাল–নীল ডোরা একটা খাম যে খাম বয়ে আনবে আমার মা, বোন, ভাইয়ের হাতের পরশ। স্নেহমাখা কথা। ভাইঝির মিষ্টি ছবি। আমার সে কি প্রচণ্ড মন খারাপ। শুধু ভাবতাম কেন বিদেশে বিয়ে হলো?

আমি যেদিন প্রথম রান্না করতে যাই সেদিন হুলস্থুল অবস্থা। পিয়াজ খুজে পাই না। আমার স্বামী দূর থেকে বলছে, ওই তো, ওই তো।

আমি তো রেগে আগুন, কই তো?

আসলে পেয়াজ আমি হাতিয়ে চলছি। কিন্তু আমার চিরচেনা পেয়াজের সঙ্গে তো মিলছে না। আমেরিকান দেশের অন্য সব বিশাল আকারের জিনিসের মতো পিয়াজের আকারও ইয়া বড়। আস্তে আস্তে ঘরকন্যায় মনোযোগী হলাম। রান্নায় ভীষণ উৎসাহ। স্বামী চলে গেলেই পরীক্ষামূলক রান্না শুরু হতো। একদিন রান্না চলাকালে চুলোর ওপরে ফ্রাইপ্যানে তেলটা হয়তো একটু গরম হয়ে গিয়েছিল। একটু ধোয়ার সৃষ্ট হলো। হঠাৎ অসম্ভব জোরে ঘরের ভেতর সাইরেন বেজে উঠলো। সেকি বিকট শব্দ! আমার তো আত্মার পাখি বের হয়ে যাবার উপক্রম। কি হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সাইরেন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে। আমি ভয়ে ঘরে ছেড়ে দৌড়ে পালালাম। কান্না পেতে থাকলো। দেশে থাকলে কি এ রকম নিঃসঙ্গ থাকতে হতো? পরে বুঝলাম, এটা ছিল স্মোক এলার্ম। আগুন থেকে সাবধান।

এর মাঝে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুললাম। চায়নিজ, মরোক্কান আমার বান্ধবী হলো। তবে তাদের ইংরেজি ছিল ভয়াবহ। তাদের কাছে গেলে আমি যাও ইংরেজি জানতাম তাও গুলিয়ে ফেলতাম। আমার শখ হলো স্বামীকে নিজ হাতে সোয়েটার বুনে দেবো। মরোক্কান বান্ধবী আমাকে সাহায্য করবে। মুশকিল হলো, ভাষা। আমি আবার দুষ্টুমি করে তার সঙ্গে সুরা বলতাম। সে ভাবলো, আমি জানি তার ভাষা অর্থাৎ আরবি। পরবর্তীকালে সে অর্নগল আরবি বলতো আমার সঙ্গে। মহাবিপদে পড়লাম। কিন্তু সোয়েটার বুনন আমি শেষ করেছিলাম। কারণ এটার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না।

বিদেশি ছাত্রের বৌ হয়ে আমেরিকায় ঢুকলে বাইরে কাজ করার অনুমতি নেই। ফলে ঘরে বসে থেকে আমার পাগল হওয়ার উপক্রম। তাছাড়া ছাত্রের যে আয় অর্থাৎ স্কলারশিপ, টিচিং, অ্যাসিসটেন্টশিপ তা দিয়ে সংসার চালানো ভীষণ দায়। অর্থকষ্ট, সময় কাটানোর কষ্ট দুই–ই প্রকট হয়ে দেখা দিল। একটাই কাজ করা যায় তা হলো, ঘরে বসে বেবি সিটিং।

প্রথম চাওয়াতে পেলাম আমেরিকান আট বছরের মেয়ে জেনিফারকে। স্কুলের পরে দুই তিন ঘণ্টা আমার কাছে থাকবে। জেনিকে আমি বেবিসিট করবো কি! উল্টো সে আমাকে দেখাশোনা করা শুরু করলো। আমেরিকান কালচার শেখাতো, খাবার চেনাতো, হ্যালোইন পার্টিতে কি করতে হয়, ইউএনও কার্ড খেলা, সাইকেল চড়ে বেড়ানো, সাতার কাটা আমি আর জেনি এক সঙ্গে করতাম। আমার স্বামী তো জেনিকে শ্যালিকা বলে সম্বোধন করতো।

আমার দিন কাটতে লাগলো ভালোই। এর মাঝে ফুলটাইম হিসেবে পেলাম ছয় মাসের জডিকে। নর্থ ক্যারোলাইনার কালো দম্পতির ছেলে মাইকেল জর্ডান, ছোট করে জডি। সে আসতো ভোর সাড়ে পাচটায়। বরফে আচ্ছাদিত প্রতিটি ভোরেই দরজাটা অল্প খুলে জডিকে ছো মেরে কোলে তুলে নিতাম তার মা বা বাবার কাছ থেকে। এবং এক দৌড়ে আমাদের লেপের তলায় জডিকে নিয়ে ঢুকে যেতাম। আমরা তিনজন। জডি আমাদের ছেলেই হয়ে গিয়েছিল। জডি বাড়ি যেতো সন্ধ্যার দিকে। সারা দিন জডিকে আগলে রাখাই ছিল আমার কাজ। তাকে আমাদের খাওয়া–দাওয়ায় অভ্যাস করিয়ে দিলাম। বাংলা বুঝতে পারতো। পরোটা ছিল তার খুবই পছন্দের।

আমার স্বামীর বাসায় ঢুকে প্রথম কাজই ছিল জডিকে কোলে তুলে নেয়া। আমি বলতাম, তাকে তুমি স্পয়েল করে ফেলেছো। এখন শুধু কোলে থাকতে চায়। জডিকে নিয়ে আমরা বাইরেও বেড়াতে যেতাম। সে কারসিটে বসে থাকতো। ততোদিনে জেনি চলে গেছে। তবুও মাঝে মধ্যে আসতো বেড়াতে। স্বামী বলতো আমাদের বড় মেয়ে।

এরই মধ্যে পার্টটাইম হিসেবে পেলাম ব্রুস আর কিমবারলিকে। জডি তো বাড়ির ছেলে হয়ে আছেই। আমার ইয়া বড় বটি দেখে (চাকুতে সুবিধা করতে পারতাম না) কিমবারলি বলতো, হোয়াট এ বিগ নাইফ?

কিমবারলি, ব্রুস তারা পছন্দ করতো ডাল, মুরগির মাংস। একদিন তাদের মা শেলি এসে রান্নার রেসিপি নিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গেলাম। পৃথিবী জুড়ে শিশু একই রকম।

আমেরিকান এক স্কুলের চতুর্থ গ্রেডের একটি ক্লাসে আমাদের ডাক পড়েছিল বাংলাদেশের ওপর কিছু বলার জন্য। আমরা দুজনই পুরো দেশীয় কাপড়ে নিজেদের উপস্থাপন করলাম। আমাদের নিজেদের পরিচিতি, দেশের পরিচিতি তুলে ধরার পর শুরু হলো তাদের প্রশ্নের পালা। আমাকে হতবাক করে দিয়ে এক ছেলে প্রশ্ন করলো, তুমি তো মুসলিম, তোমার কপালে টিপ কেন? এছাড়াও আমাদের গৃহপালিত জন্তু কি এবং তাদেরকে আমরা কি নাম ধরে ডাকি ইত্যাদি সব প্রশ্ন।

আমি ভীষণ উৎসাহে আমাদের দেশের অসৎ রাজনীতিবিদদের নামে গৃহপালিত জীবজন্তুর নাম চালিয়ে দিলাম।

আন্তর্জাতিক সপ্তাহে আমরা মহাউৎসাহে স্টুডেন্ট সেন্টারে টেবিল নিয়ে বসলাম। আমাদের সে কি শাড়ি–গহনা পরার ধুম। দেশীয় জিনিসপত্র টেবিলে রাখা হলো। ভিসিআর–এ সারাক্ষণই প্রদর্শিত

হলো আমাদের দেশের বিয়ের অনুষ্ঠান। বিদেশিরা টেবিলে রাখা শাড়ি নেড়েচেড়ে বলে, হোয়াট এ লং বেড কভার!

আমাদের তৈরি চটপটি, সিঙাড়া, বিরিয়ানি দেদারসে বিক্রি হলো। সে কি উৎসব উৎসব ভাব চারদিকে।

রাতে ফ্যাশন শো করলাম। আমার স্বামী লুঙ্গি, ফতুয়া আর গামছা নিয়ে স্টেজে উঠলো। আমি সাজলাম নববধূর সাজ। আমার স্বামীর লুঙ্গি ধরে শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েরা বলে, নাইস স্কার্ট।

ক্যানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন থেকে আমরা অংশ নিতে পনেরো জনের একটি দল সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ষোল ঘণ্টা হই চই করতে করতে চলে গেলাম শিকাগো বঙ্গ সম্মেলনে।

এতো ব্যস্ততার পরেও বুকের ভেতর খচ খচ করে কিসের যেন অভাবে। পহেলা ফাল্গুন, বই মেলা, রমজান, ঈদ, পহেলা বৈশাখ কোনদিক দিয়ে আসে যায় ধরতেও পারি না। দেশের খাওয়া-দাওয়া অসম্ভব মিস করি, বিশেষ করে ইলিশ মাছ, দেশীয় মাছ, আশপাশের কোথাও নেই। এরই মাঝে আমার ভাই আটলান্টা থেকে দুইটা ইলিশ মাছ পাঠালো। সঙ্গে সঙ্গে ইলিশ মাছের পার্টি হয়ে গেল। সব বাঙালি জড়ো হলো। মনে হলো বহুদিন পরে অমৃত খেলাম। দেশ থেকে আসার সময় কে যেন চেপা শুটকি নিয়ে এসেছিল। সেই শুটকির ঘ্রাণে প্রতিবেশী তো বটেই হাউস বিল্ডিংয়ে কমপ্লেইন ছাপিয়ে পুলিশ পর্যন্ত গড়ালো। এরই মাঝে ফার্মে গিয়ে গরু, খাসি জবাই করে গোশতও আনা শুরু হলো। হাউজিং থেকে বরাদ্দকৃত প্লটে সবজি বোনা শুরু হলো। লেকে গিয়ে বাফেলো, রুই, মাগুর মাছের মতো খেতে ক্যাট ফিশ বড়শি পেতে ধরা শুরু হলো।

আস্তে আস্তে সবই মেনে নিচ্ছিলাম, গেথে যাচ্ছিলাম আমেরিকান জীবনে। এই দেশে বাস করেও নিজেদের মতো করেই দিন যাপন করছি। দেশকে মনে হয় স্বপ্ন দেখা কোনো জায়গা। বুকের ভেতর সারাক্ষণই কষ্টের বীণা রিন রিন করে বেজে চলে।

আমরা ক্যানসাস, টেকসাস, পেনসেলভেনিয়া হয়ে বর্তমানে নিউ ইয়র্কে বসতি গেড়েছি। আমার স্বামীর বহু কষ্টের ছাত্র জীবন শেষ হয়েছে। আমেরিকান এটর্নি হিসেবে কাজ করছে। ভেবেছিলাম ছাত্র জীবন শেষ হলেই বুঝি সব পেয়েছির ঠিকানা পাবে। না? তা নয়। প্রবাস মানেই জীবন যুদ্ধ। ননইমিগ্রান্ট হিসেবে প্রবেশ করে পার্মানেন্ট ইমিগ্রান্ট হতে হতেই জীবনের রঙ অনেকখানি শুকিয়ে যায়। জীবনের নিরাপত্তা হয়তো আছে। কিন্তু এই নীল চোখের শাদা চামড়ারা আমাদেরকে শুষে শুষে নেয়। তার ওপর আছে স্বদেশি প্রতারক যারা নীল চোখ, শাদা চামড়ার থেকেও ভয়ংকর। গত দশ বছর করেছি একটি লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রাম, এখন শুরু হয়েছে অন্য এক ধরনের সংগ্রাম।

বাংলাদেশকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় ফেলেছে। চারদিকেই শুধু হা-হুতাশ। আগে এ দেশটাকে মনে হতো আমিও এদের একজন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, তা নয়। কেমন জানি পর পর মনে হয়। ভয় ভয় লাগে। মনে হয় দেশেই যদি থাকতাম তাহলে ভালো হতো। না একূল, না ওকূল – দুকূলের মাঝে পড়ে কূল ছাপানো চোখের জলে দিন-রাত ভাসছি।

নিউ ইয়র্ক থেকে

দূরত্ব

–সাইমুম ইসলাম

আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল বয়স। যুথী ছিল আমার থেকে দুই ক্লাস এবং দুই বছরের বড়। তারপরও সব সাধারণ নিয়ম ভেঙে আমাদের ভালোবাসা হয়ে গেল। সময়টা ছিল এমন যে, কলেজের সীমা আমি অতিক্রম করতে না পারলেও যুথী তার ইউনিভার্সিটির জীবনে ব্যস্ত। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমরা সাজিয়েছিলাম বয়সের ব্যাপারটি মাথাতে রেখেই।

আমি বুঝতাম যে, আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাই আমার নজর ছিল সব চার বছরের ডিগ্রিগুলোর দিকে। যুথীও খুব উৎসাহ দিল। জানি না কোনো রোবটও এতো পরিশ্রম করতে পারে কি না যতোটা যুথীর উৎসাহে আমি করেছিলাম। ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। পত্রপত্রিকাতে যাদের ছবি ছাপা হয় এমন বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে ভালো বিভাগটিতে পড়ার সুযোগ পেলাম। আমাকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন বাবা–মা অনেক আগেই বিসর্জন দিয়েছিলেন ভালো ছাত্র না হওয়ার কারণে। কিন্তু হঠাৎ এই ভালো রেজাল্টে তারা খুবই খুশি হলেন। আমি ভাবলাম, ভালোবাসা মহান।

যুথীর সঙ্গে আমার সময় ভালোই কাটছিল। *শুধু তোমার ভালোবাসাতে, দুঃখ জানি না আমি কাকে বলে,* মান্না দে–র গান শুনে অবাক হতাম। আমার মনের কথা জানলো কি করে! তখনই হঠাৎ করে আমার বাসার সবাই জেনে গেল আমার এবং যুথীর ভালোবাসার কথা। দুই পরিবারের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেল এবং খারাপ হলো আমার রেজাল্ট। আমার বিভাগে আমি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে এলাম। থার্ড ইয়ারে আবার পড়ালেখাতে মন দিলাম। ভালো রেজাল্টও করলাম। আমার নাম চলে এলো আবার প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। ততোদিনে যুথীর পড়াশোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। রেজাল্টও ভালো। যুথীর বড় বোন আমেরিকাতে থাকেন। যুথীকে তিনি বললেন আমেরিকাতে উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার জন্য।

আমরা ভাবলাম, এটা ভালো সুযোগ। কেননা আমার বিভাগের বেশির ভাগ সিনিয়র ভাইয়েরা তো আমেরিকাতেই উচ্চ শিক্ষা নিতে গেছেন। আমিও তো যাই যাই করছি। প্রবাসী জীবনের এ সময়ের মাঝে হয়তো বা দুই পরিবারের সবারই মাথা ঠাণ্ডা হবে।

বাংলাদেশ থেকে তখন আমেরিকার ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১–এর আগের কথা। দুইবার চেষ্টায় দ্বিতীয়বারে যুথীর ভিসা হয়ে গেল। যুথী চলে গেল আমেরিকা। তার আট মাসের মাথায় চার বছরের ডিগ্রি সাত বছরে শেষ করলাম। বিদেশে অনেকে প্রশ্ন করেছে, কম কম বিষয় নিয়ে ভালো রেজাল্টের আশাতে দীর্ঘ সাত বছর পড়েছি কি না। একই ইউনিভার্সিটিতে চাকরিতে যোগ দিলাম। আমার আমেরিকার ভিসা পাওয়া হলো না।

অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেলাম। যে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম তার মান ভালো না হওয়াতে কানাডাতে পাড়ি দিলাম। এর মাঝে সময় চলে গেছে আরো দেড় বছর। যুথীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। কিন্তু যুথী আর আগের মতো নেই। নয় বছরের ভালোবাসা কেমন যেন মিথ্যা মনে হয়। যে যুথীর

শরীরের প্রতিটা অংশ আমার কাছে ফুলের মতোই পরিচিত বলে মনে হতো সেই যুথীকে কেমন অস্পষ্ট বলে মনে হয়। একটা সময় ছিল যখন সমস্ত দিনে ছয় সাতবার কথা না হলে যুথী অস্থির হয়ে উঠতো। অথচ আমার সঙ্গে যুথী কথা বলতে চাইতো না। স্পষ্ট করেই বলতো যে, আমার কথা তার আর ভালো লাগে না। আমি কথা বলি অশিক্ষিত লোকদের মতো, আরো অনেক কিছু। আমার অর্থবিত্তের ঘাটতি, আপাত নড়বড়ে প্রতিষ্ঠা, বিদেশের মাটিতে স্থায়ীভাবে থাকতে পারার কাগজ না থাকাটা বড় দোষের হয়ে উঠেছিল। বুঝতাম আশপাশের লোকজনের মাঝে বাংলাদেশে বড় হওয়া মেয়ে হিসেবে তার একটা আলাদা কদর ছিল। সেখানকার প্রতিষ্ঠিত অনেকের মাঝে হয়তো বা আমার যোগ্যতা নিচু স্তরেরই ছিল।

প্রথম প্রথম যুথীর ওপর খুব রাগ হতো। তাকে খুব লোভী মনে হতো। পরে ধীরে ধীরে ভাবতে শিখলাম, অনেক সুন্দর সব সময়ের জন্য আমার বরং যুথীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তখন যুথীর ওপর রাগ করার জন্য নিজেকে খুব ছোট মনে হতো।

কিছুদিন আগে ছোট ভাই ই-মেইলে জানালো যে, বাবা-মা আমাদের ভালোবাসা মেনে নিয়েছেন। আমাদের বিয়ের কথা তারা ভাবছেন। যুথীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তুতি চলছে। মায়ের সঙ্গে কথা হলো। জানতে চাইলেন কবে দুজনার এক সঙ্গে দেশে ফেরার সময় ও সুযোগ হবে। আমি জানিয়ে দিলাম যে, পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত। দেশে যাওয়া-আসার টাকা কোথায় পাবো? সবাইকে বললাম, এখন যেন তারা এসব ব্যাপার নিয়ে না ভাবেন।

মাকে জানানো হয়নি যে, আমার প্রবাস জীবনে ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পাবার রাস্তাটি মসৃণ হলেও ভালোবাসার মানুষটিকেই আমি হারিয়ে ফেলেছি। সময় পেলে এসব অতীত এবং সদ্য অতীতের স্মৃতিচারণ করি, আর ভাবি হায়রে প্রবাস জীবন!

কুইবেক, কানাডা থেকে

মিস আন

–ফারুক আহমেদ

পাওয়ার আনন্দের মুহূর্তগুলো অতি ক্ষণিকের। বরং না পাওয়ার বেদনা নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের জীবনপ্রবাহ। এই ক্ষণিকের আনন্দের স্মৃতিটুকু লালন করেই না পাওয়ার বেদনাকে অতিক্রম করছি। তাই তো পাওয়ার এই আনন্দটুকু স্মরণীয় হয়ে থাকে স্মৃতির পাতায়। বাধিয়ে রাখি হৃদয়ের ফ্রেমে অতি যত্নে। একাকীত্বে মেলে ধরি আর স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি ক্ষণে ক্ষণে। সাত বছরের প্রবাসী জীবনের স্মৃতির পাতা থেকে লুকায়িত স্মরণীয় ঘটনাটি তুলে ধরছি যায়যায়দিনের *প্রবাসী* সংখ্যায় পাঠকদের উদ্দেশ্য। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০০ সালের ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে কেন্দ্র করে।

মেয়েটির নাম আন জে হুন। আমার কম্পানির অফিসের একজন অ্যাসিস্টান্ট। মিস আন বলে ডাকতো সবাই। স্বভাব এবং ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ। তবে আমাকে কেমন যেন একটু ভিন্ন চোখে দেখতো। খাওয়ার সময় একই সঙ্গে একই টেবিলে সামনাসামনি খেতে বসতো।

খেতে খেতে অনেক কিছু আলাপ হতো। অনেক কিছু জানতে চাইতো। এই জানাজানি থেকে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসা। ছোট ছোট আবেগ, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল উষ্ণ নিবিড় এক সম্পর্ক। তার সূত্র ধরে ডেটিং করে বাইরে বেড়াতে যাওয়া, পিৎসা শপে গিয়ে তার পছন্দের পিৎসা খাওয়া, কফি শপে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আলাপ করা। বেশির ভাগ আলাপে স্থান পেতো বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার টিনএজারদের রোমাঞ্চকর প্রেম–ভালোবাসা এবং বৈবাহিক বিষয়ে অবর্ণনীয় দিকগুলো।

একদিন তার কাছ থেকে সুন্দর একটা চকলেটের প্যাকেট পেলাম। রান্নার কাজে নিয়োজিত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতে বললো, আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস ডে। এই দিনে মেয়েরা ভালোবাসার মানুষকে চকলেট গিফট দেয় এবং ছেলেরা গিফট দেবে ১৪ মার্চ।

আনন্দ প্রকাশের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ এই প্রথম কোনো মেয়ের কাছ থেকে ভ্যালেন্টাইনস ডে–র গিফট পেলাম। তাও একজন বিদেশি মেয়ের কাছ থেকে! ক্যালেন্ডারের গায়ে ১৪ মার্চকে লাল কালির বৃত্তে বন্দী করে রাখলাম। সময়ের চাকা মাড়িয়ে এলো বহু আকাঙ্ক্ষিত ১৪ মার্চ। আগের দিন পরামর্শ দানকারী ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মিস আনকে কি গিফট দেয়া যায়?

উত্তরে যা বললো তাতে আমার তো দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। প্যান্টি আর ব্রা। শব্দ দুইটি উচ্চারণ করতেও কেমন যেন লাগছে। যদিও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য অতি সাধারণ একটা ব্যাপার তবুও তার কথা মানতে হলো।

যাক ভালোবাসাকে অঙ্গে জড়িয়ে দিতে গেলাম রাসন মার্কেটে প্যান্টি আর ব্রা কিনতে। দোকানের সামনে গিয়ে লেফট–রাইট করলাম কমপক্ষে বিশবার। লজ্জা, সংকোচে শরীর হাটু সমানে কাপছিল। অবশেষে আল্লাহর নাম নিয়ে ঢুকে গেলাম দোকানে। সেলসম্যান একজন মেয়ে, বয়স পচিশ ছাব্বিশ বছর হবে হয়তো। আমি গিয়ে দাড়ালাম যেখানটায় সেখানটায়, প্যান্টি, ব্রা সাজানো।

আমাকে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, কি দেবো?

প্যান্টি, ব্রাকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলাম।

বিভিন্ন রকমের প্যান্টি, ব্রা বের করে দেখালো।

কোন রঙয়ের দেবো?

এই রঙটা।

কোন ডিজাইন?

লেটেস্ট ডিজাইন।

সাইজ কতো?

এটাকে তো লেটেস্ট সাইজ বলা যাবে না, সাইজও আমার জানা ছিল না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বললাম, সাইজ তো আমার জানা নেই।

সে জিজ্ঞাসা করলো, মেয়েটা কোন দেশি?

কোরিয়ান।

বিবাহিত, না অবিবাহিত?

অবিবাহিত।

ফিগার কেমন? আমার মতো?

না, তোমার থেকেও হালাক। বড়জোড় পয়ত্রিশ কেজি হবে।

সে হেসে দিল। আচ্ছা, তোমাদের দেখা–সাক্ষাৎ মানে সম্পর্ক কতো দিনের?

এই সাত আট মাস হবে।

আশ্চর্য! সাত আট মাসের সম্পর্ক, অথচ এখনো তার বুকের সাইজটাও জানো না? তুমি আসলে একটা বোকা।

এই বোকাকে বোঝাতে না পেরে মেয়েটি তার ববকাট মাথাটা এদিক–ওদিক কাত করছিল। ওই সময় পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল মুখ চেনা এক বাংলাদেশি। তাকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বললাম। সে আমাকে বাংলায় বললো, হাত দিয়ে দেখান তো ভাই। সাইজটা কতো বড় হতে পারে?

আমার হাতের আঙুল দিয়ে সাইজের একটা ধারণা দিতে গিয়ে মেয়েটা দেখে ফেললো। হাসতে হাসতে মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল তখন।

তারপর একটা প্যান্টি এবং ব্রা সেই দিয়ে বললো, এটা নিয়ে যাও, যদি না হয় তাহলে নিয়ে এসো বদলে দেবো। তবে সাইজটা জেনে আসবে।

অবশ্য প্রয়োজন পড়েনি।

মিস আন আমার দেয়া গিফট পেয়ে এতো আনন্দিত হলো যে, সেই আনন্দের ছোয়া লাগলো আমার ছোট্ট হৃদয়টাতে। অজানা এক অনুভূতি জাগলো। সেই অনুভূতির কথা বলতে পারলাম না। আমার মধ্যে যে দেয়াল সেই দেয়াল সীসা ঢালা প্রাচীরের চেয়েও শক্ত। বয়সের ব্যবধান দশ বছর যা দক্ষিণ কোরিয়ায় সম্পূর্ণ বেমানান। আমাকে চুপ থাকতে দেখে এক সময় সে চলে গেল। আমি বসে রইলাম বত্রিশ বছরের দেহটা নিয়ে। বুঝতেই পারছেন পাঠক, মেয়েটি বয়স ছিল বাইশ বছর।

সময়ের তালে তালে বেচে থাকার তাগিদে আমরা প্রত্যেকেই ঘুরছি দেশ থেকে দেশান্তরে। সেও চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে বছর তিনেক আগে। মানুষ চলে যায়। একদিন মরেও যাবে। এটা চিরন্তন। স্মরণীয় হয়ে থাকবে ফেলে আসা দিনগুলো।

মিস আন নামের মেয়েটিও আজ শুধুই স্মৃতি। তার জন্য প্যান্টি, ব্রা কেনার ঘটনাটি মনে হলে আজও নিজের অজান্তে হেসে ফেলি।

সাউথ কোরিয়া থেকে

উপলব্ধি

- মৌমিতা আনোয়ার পান্না

আমি সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন হওয়া সত্ত্বেও মা আমাকে কোনো অনুষ্ঠানে যেতে দিতেন না। এ জন্য ছোটবেলায় আমার খুব খারাপ লাগতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, দাদিমার বকুনির ভয়ে মায়ের এই আচরণ। ভীষণ রাগ হতো দাদিমার ওপর। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেতাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, বড় হয়ে এই পরাধীনতার শিকল ভাঙবোই।

দাদিমা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। স্নেহের পরশ বুলিয়ে কতো কি খেতে দিতেন। এগুলো আমার কাছে মূল্যহীন মনে হতো। তার শাসনের বেড়াজালে আমার পিত্রালয় হলো আমার বিচরণের গণ্ডি। নানাবাড়ি পাশাপাশি গ্রাম শিমুলিয়া হওয়ার পরও খুব সীমিত সময়ের জন্য যেতাম। বেশি দেরি হলে ফিরে এসে দাদিমার বকুনির মুখে পড়তাম। যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম তখন আমার বিচরণের ক্ষেত্র আরো একটু বিস্তৃত হলো।

স্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরতে হতো। বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে পরিচিতজনের অগোচরে ক্লাস ফাকি দিয়ে যেতাম এবং স্কুল ছুটির সময় হলেই বাড়িতে চলে আসতাম। কালের অমোঘ বিধানে আমার দাদিমা সকল মায়ার বাধন ছিন্ন করে পরলোকগমন করেন। অনুভব করলাম পরাধীনতার শৃঙ্খল নয়, পরম মমতায় স্নেহের আচল যেন খসে পড়লো মাথার ওপর থেকে। দাদির মৃত্যুর পর আমাকে কোথাও যেতে মা নিষেধ করতেন না। কারণ এতোদিনে আমার নিয়ন্ত্রণের রিমোট হাত বদল হয়েছে

হঠাৎ ক্লাস টেন–এ পড়া অবস্থায় আমার বিয়ে হয়ে গেল। বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরালয়ে আগমন ঘটলো। মাতৃঙ্গন থেকে শৈশব, কৈশোরের স্মৃতিগুলোকে দূর্বা ঘাসের ওপড় শিশির বিন্দুর মতো দুই পায়ে মাড়িয়ে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশের মুখোমুখি হলাম। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন। গ্রামের নাম শসষপুর। মানুষেরাও মুক্ত মনের অধিকারী। সবচেয়ে ভালো আমার শাশুড়িমা যেন মায়ের স্বরূপ। তার শাসনের রূপ আলাদা। সব সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে নম্রভাবে চলাফেরা করবে, আড্ডা দেবে না। সংসারের কাজ নিজে করার চেষ্টা করবে।

তার ভাষায় :

জামাই নষ্ট হাটে

মেয়ে নষ্ট ঘাটে

বৌ নষ্ট চাটে (আড্ডা)।

তার অর্থ কাজে ব্যস্ত থাকলে আড্ডা দেয়ার সময় পাবে না। বৌও নষ্ট হবে না। এসবই এখন আমার কাছে সোনালি অতীত। কেননা জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে জন্মভূমি ছেড়ে বহুদূরে চলে এসেছি। কিন্তু মনটা সব সময় ছায়া, সুনিবিড় বিক্রমপুরের মায়া–মমতার রাজ্যে বিচরণ করে।

পূর্ব এশিয়ার শিল্প উন্নত একটি দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটির পূর্বে জাপান, পশ্চিমে চায়না, উত্তরে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণে তাইওয়ান, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া। ভৌগোলিক অবস্থান খুব ভালো এবং সমুদ্রপথে উৎপাদিত পণ্য অতি সহজে অস্ট্রেলিয়া, ইওরোপ, আমেরিকা, আফ্‌কার বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করতে পারে বিধায় এখানে প্রতি বছরই নতুন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক কোরিয়ান নাগরিককে (পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক) তিন বছরের জন্য আর্মি ট্রেনিংয়ে যেতে হয়। এখানে জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ নিপুণভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে প্রতিটি কোরিয়ান দক্ষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

এক সময় অনেক কোরিয়ান মিডল ইস্ট–এ বাংলাদেশিদের সঙ্গে চাকরি করেছে। সেখানে অর্থ উপার্জন করে আমাদের মতো বাড়ি, গাড়ি, দোকান না কিনে কোরিয়ায় শিল্প কারখানা স্থাপন করেছে। এখনো প্রতিটি চাকরিজীবী কোরিয়ানের স্বপ্ন থাকে কিভাবে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যায়।

দশ বারো বছর চাকরির পর অর্থ সঞ্চয় করে চাকরিকালীন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প কারখানা গড়ে তোলে এবং কারখানাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিন–রাত কঠোর পরিশ্রম করে। কারণ এরা মনে করে, *পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি*। শ্রমের কোনো বিকল্প নেই। শ্রম, অর্থ, মেধা এবং সময় ব্যয় করলে সাফল্য অনিবার্য।

আমাদের মতো একজন কাজ করে আর পরিবারের সকলেই অন্ন গ্রহণ করে না। প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই কাজ করে। এখানে দ্রব্যমূল্য বাড়লেই কর্মজীবীদের বেতনও বাড়ানো হয়। এখানে সকল পেশাই সমমর্যাদার। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ডাক পিয়ন সকলেই সচ্ছল। বলা বাহুল্য, ডাক্তারের চেয়ে নরসুন্দর বা নাপিতের আয় বেশি ছাড়া কম নয়।

এক সময় আমি ইলসান সিটিতে এক বাসায় ভাড়াটিয়া ছিলাম। বাসার মালিকের বাড়ি, গাড়ি এবং প্রচুর ধানি জমি ছিল। তারপরও বাড়িওয়ালি ভোর চারটায় উঠে পাশ্ববর্তী সুপারমার্কেটে ঝাড়ু দিয়ে আসতো বাড়তি আয়ের জন্য।

প্রথমে বুঝতে পারিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ভোর বেলা আপনি কোথায় যান?

নিঃসঙ্কোচে ঝাড়ু দেয়ার কথা বললেন। কল্পনায়ও ভাবা যায় না আমাদের দেশের কোনো বাড়িওয়ালি অন্য কোথায়ও ঝাড়ুদারনীর কাজ করবে। কোরিয়ান প্রতিটি ছেলেমেয়েরা সমান অধিকার এবং মর্যাদা নিয়ে বড় হয়। মায়েরা গর্ভবর্তী হলে কর্মবিরতি দেয় এবং অধিকাংশ মায়েরা পর পর দুটি বাচ্চা নেয়। চার পাচ বছর বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। এবং কোনো কোনো মহিলা গর্ভাবস্থায়ও কাজ করে এবং শিশু প্রসব হলে চিলড্রেন কেয়ার–এ রেখেও অনেকে কাজ করে। চার পাচ বছর বয়স হলে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানো হয়।

কোরিয়ায় গর্ভাবস্থার সময় থেকে বয়স হিসাব করা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে শিশুর বয়স দুই বছর, কোরিয়ায় তিন বছর।

শিশুকালেই পিতা–মাতা শিশুকে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করে যা আমাদের দেশে অকল্পনীয়। ফলে একটি ছেলে একাধিক মেয়ের এবং একটি মেয়ে একাধিক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। পরিচয়ের প্রথমে ইনসা (সালাম) দেয়ার পর পরস্পরের নাম এবং বয়স জেনে নেয়। সকল ক্ষেত্রে নাম এবং বয়স বলতে হয়। ফলে শিশুরাও নিজেদের বয়স সঠিকভাবে বলতে পারে। এরা বয়োজ্যেষ্ঠদের খুব মান্য করে। দীর্ঘ দিনের সহঅবস্থানের ফলে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালো এবং নির্ভরযোগ্য মনে হয় তাকেই স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করে।

অনেক সময় ত্রিভুজ প্রেমের সৃষ্টি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে নিজে নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করে। সমাধানে উপনীত হয়। ফলে একজন নীরবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে প্রস্থান করে। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও পরিলক্ষিত হয়। বিয়ে করার আগে ভাবী শ্বশুর–শাশুড়ির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ পিতামাতা বিয়েতে সম্মতি দেন। পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের বয়স সচরাচর সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। পাত্র এবং পাত্রী কাজ করে মোটামুটি সচ্ছল হয়ে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিয়ের পর অনেকে সাবেক বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমেও জড়িয়ে পড়ে। প্রায় তিন বছর হলো কোরিয়াতে আছি। চাক্ষুস দেখা তো দূরের কথা, কখনো শুনিনি কোনো ধর্ষণ বা খুনের ঘটনা। দিন–

রাত যে কোনো সময় নিশ্চিন্তে মেয়েরা চলাফেরা করতে পারে যা আমাদের দেশে আদৌ সম্ভব নয়। ভবিষ্যতেও আশা করতে পারি না।

আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। দেশে থাকতে ভাবতাম প্রবাসী হওয়ার মতো সুখ মনে হয় ত্রিভুবনে নেই। এখন মনে হয়, এক দেশে জন্ম নিয়ে পেটের তাগিদে অন্য দেশে থাকার চেয়ে বেশি কষ্ট আর নেই। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে দেশের চিন্তা। সর্বদা প্রিয়জনদের দর্শনের জন্য আঁখি পিপাসিত। হৃদয়ের বন্দরে কতো চেনামুখ ভিড় করে। শিল্পে উন্নত এই দেশে রূপ, রস, গন্ধে ভরা সকল কিছুই আছে। জীবনধারণের জন্য কোনো কিছুর অভাব নেই। যখন যা ইচ্ছা, করতে পারি, কোনো বাধা নেই। তারপরও যেন অন্তরে কিসের অভাব অনুভব করি। মনটা হাহাকার করে মাতৃহীন শিশুর মতো। অতীতের মধুর স্মৃতির ভারে চোখের কোণে জমে উঠে বেদনার অশ্রুবিন্দু। ফিরে যেতে ইচ্ছা করে বিক্রমপুরের মেঠো পথে, শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে হেমন্তের শিশির সিক্ত দূর্বা ঘাসে। ফুলে ফলে শিশিরের ঘ্রাণ নিতে হৃদয় ব্যাকুল হয়। রোদেলা দুপুরে বদ্ধপুকুরে অবাধ সাতার দিতে মন চায়। জোনাকি জ্বলা সন্ধ্যাবেলা ঝি ঝি পোকার ডাক শোনার জন্য কান পেতে রই। বাস্তবে কিছুই হয়ে ওঠে না। মনটা অতৃপ্ত, অশান্ত হয়ে থাকে। যখন রাজধানী সিউলের রাস্তা দিয়ে হাটি তখন আমার প্রিয় ঢাকার কথা মনে পড়ে।

কোনো গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাটলে মন আমার বিচরণ করে পল্লিমা বিক্রমপুরের খড়িয়া, শমষপুর, ভাগ্যকোল আরো অনেক গ্রামে। কোরিয়ার সবচেয়ে বড় নদী হাং গাং–এর তীরে বেড়াতে গেলে আমার প্রিয় নদী পদ্মায় আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বিদেশে না এলে দেশপ্রেম কি জিনিস বুঝতে পারতাম না।

পত্রিকার পাতা খুললেই দেখি খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, দুর্নীতির ঘটনা। এতো কিছুর পরেও মনে হয়, *সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি* যেখানে আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছে।

কোয়াংজু সিটি, কোরিয়া থেকে

চাকরি

– হালিম

একটি মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি, যাদের ওয়ার্ল্ডওয়াইড, বিশেষ করে মিডল ইস্টের দেশগুলোতে অসংখ্য শাখা রয়েছে তার একটি শাখায় যা সউদি আরবে রয়েছে সেখানে আমি কাজ করি। এদের কাজ রেডিমেড গার্মেন্টসের কাপড় বিক্রি করা। আমাদের কম্পানির সব শাখাই বৃটিশ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত। এরা নিয়ম–কানুন ছাড়া কিছুই বোঝে না। পান থেকে চুন খসলেই শুনতে হয় ইংরেজিতে গালমন্দ। কাজ যদিও কাপড় বিক্রি করা, তবুও নিয়ম–নীতির শেষ নেই।

আমি এবং আরো সাতজন বাংলাদেশি সউদি আরবে আসি ১৯৯৫ সালের জুন মাসে। আমি ১৯৯৭ সালে একবার এবং ১৯৯৮ সালে আরেকবার প্রমোশন পেয়ে সহকারী ম্যানেজার হই। তারপর

ম্যানেজার হওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু দেশের মতো বিদেশেও যে ইয়েস বস, ইয়েস বস করতে হয় তা ততোটা বুঝতে পারিনি। ফলে বার বার প্রমোশন বন্ধ হয়ে যায়।

এর চূড়ান্ত পরিণতি রূপ নিল ২০০০ সালে ১৩ জুনে যখন কম্পানির ঊর্ধতন কর্মকর্তা আমাদের দোকান ভিসিট করতে এলেন। শুরু থেকেই বোধহয় আমার এপ্রোচ তার পছন্দ হয়নি। কারণ বসদের অনুগত আমি হলেও কখনো এর চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারি না। এ কথা সে কথার পরে তিনি হঠাৎ করে বলে বসলেন, Do you know the meaning of bullshit?

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। তর্ক জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে। এক পর্যায়ে আমার উপরের বস আমাকে থামানোর জন্য বললেন, Don't argue with your boss.

ব্যস, সেখানেই ঘটনার পরিসমাপ্তি। সেই ঊর্ধতন বস আমাকে অ্যারোগ্যান্ট, অ্যাগ্রেসিভ উপাধি দিলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন, ম্যানেজার-এর প্রমোশনের জন্য আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

সেই থেকে এখনো একই পজিশনেই আছি। সেই বস থাকা পর্যন্ত আমার প্রমোশন হবে কি না সন্দেহ।

মাঝে মধ্যে মনে হয়, রাগে-দুঃখে, অভিমানে চাকরি ছেড়ে দিই। কিন্তু নানান সীমাবদ্ধতার কারণে হয়ে ওঠে না।

এতো কিছুর পরেও কষ্ট করে বিদেশে চাকরি করার মধ্যে আলাদা একটা তৃপ্তি আছে যার কারণে এখনো চাকরিতে আছি।

haleem97@hotmail.com
সউদি আরব থেকে

আবু ধাবিতে

- এস.আর চৌধুরী

নব্বই-এর দশক। কলেজের পাট চুকিয়ে পরিবারের সবাইকে অগ্রাহ্য করে এক বন্ধুর সহায়তায় পাড়ি জমালাম মরুভূমির দেশ আরব আমিরাতে। পরিবারের কেউ চাচ্ছিলেন না আমি প্রবাসী হই। কারণ কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো, কি করবো ইত্যাদি, সবাই একটু শংকিত ছিলেন। আমার ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয়স্বজন বিদেশে থাকেন না। তাই তারা আমাকে বিদেশের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিলেন।

সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে যখন আমি সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম তখন আর কেউ বাধা দিলেন না। এক সুন্দর সকালে আমি ফুজিরা এয়ারপোর্টে নামলাম।

কিছুদিন বেকার থাকার পর কাজ মিলে গেল একটা কম্পানিতে। ওই কম্পানির চিফ টেকনিশিয়ান ছিল একজন পাঠান। সে বাঙালিদের পছন্দ করতো না। তবুও তার সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হতো। সে যেমন পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো তেমনি আমিও নামাজ পড়তাম। তার সঙ্গে নিয়মিত নামাজ পড়া এবং কাজের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে সে আমাকে কিছুই বলতো না। একদিন বললো, তুমি তো

নিয়মিত নামাজ পড়ো। আর তোমার কাজ শেখারও আগ্রহ আছে। তবুও আমি বাঙালিদের পছন্দ করি না।

আমি তাকে বললাম, দেখো, তুমিও মুসলমান আর আমিও। হাদিস শরিফ মতে, তুমি আমায় ঘৃণা করতে পারো না। কারণ আমরা ভাই ভাই।

এরপর থেকে সে আমাকে কাজে সহযোগিতা করতো। বেশ কিছুদিন কাজ করার পর ভালো বেতনে অন্য একটা কম্পানিতে আমি চলে গেলাম। টেকনিশিয়ান হিসেবে এই কম্পানিতে এলাম। এখানকার প্রায় সবাই ছিল ইনডিয়ার কেরালার অধিবাসী। তারা আমাকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু মুখ ফুটেও কিছু বলতো না। কাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো।

একদিন সকালে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এলেন একজন টেকনিশিয়ানের জন্য। তার বাসার এসি গোলমাল করছে। ওটা একটু দেখার জন্য। এই ইঞ্জিনিয়ার আবার সবচেয়ে বদমেজাজি। সবাই আমাকেই পাঠালো ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। অর্থাৎ সতীনের ছেলেকে দিয়ে সাপ ধরার মতো। আমি ভয়ে ভয়ে তার সঙ্গে গেলাম। কাজে হাত দেয়ার পর বুঝলাম ঘটনা জটিল কিছু নয়। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে এসি চালু করলাম। আর গোলমাল করলো না। এসি প্রায় দুই ঘণ্টা চলার পর যখন গোলমাল করলো না তখন বুঝলাম কাজ ওকে।

ইঞ্জিনিয়ারও মহাখুশি। ওনার স্ত্রী এবার আমাকে কিচেনে নিয়ে গেলেন। একটা মাল্টিপারপাস বার্নার দেখিয়ে বললেন, এটার অবস্থাও একই। এটা যেন একটু পরীক্ষা করে দেখি।

আমি সাপ্লাই অন করে বার্নার চালু করলাম। দেখলাম উপরে কিছু রাখলেই এটা সমস্যা করে। সাহস করে খুললাম। খুলে দেখলাম নিউট্রাল আর্থ লিংক হয়ে এই অবস্থা হচ্ছে। লিংকটা বিচ্ছিন্ন করে ইনসুলেশন করে দিলাম। এতে কাজ হলো।

আমি ওই মহিলার কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করলাম। ওনারা ছিলেন লেবাননি। এরপর থেকে বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় যেতে হতো। ইতিমধ্যে আমিও সিনিয়র টেকনিশিয়ান হিসেবে প্রমোশন পেয়ে গেলাম। বেতনও বাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ইনডিয়ানদের হিংসার পাত্রে পরিণত হলাম।

ইঞ্জিনিয়ারের এক মেয়ে ও এক ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় যে, এরা আমার সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে থাকতো। আমার দেশ সম্বন্ধে জানতে চাইতো। একবার আমাকে ইংরেজিতে লিখতে দিল উট সম্বন্ধে রচনা। আমি গরুর রচনার আদলে লিখে দিলাম। ওরা তো মহাখুশি।

সুখ মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী হয় না। বেশ কিছুদিন পর ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে দেশে যাবেন, সঙ্গে আমাকেও নিতে চাইলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার ভিসায় কিছুটা সমস্যা থাকায় যেতে পারিনি। ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছিলেন ওখানে আমাকে কাজ জুটিয়ে দেবেন। যাক, তিনি চলে গেলেন। পরে ইনডিয়ানদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলাম। এর মধ্যে সরকার ঘোষণা করলো অ্যামনেস্টি আইন। দুই মাস পর চলে গেলাম দেশে।

কয়েক বছর পর আবার এলাম আমিরাতে। খবর নিয়ে জানলাম, আমার শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ সপরিবারে এখন আমেরিকায়। তিনি যেখানেই থাকুন, তার প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে